Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ফেমিনিজমের মুখোশ উন্মোচন : নারীর অধিকার নাকি পারিবারিক ধ্বংস

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নুসরাত জাহান

রোলঃ 23090121725

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ফেমিনিজমের মুখোশ উন্মোচন : নারীর অধিকার নাকি পারিবারিক ধ্বংস

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নুসরাত জাহান

রোলঃ 23090121725

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ফেমিনিজমের মুখোশ উন্মোচন : নারীর অধিকার নাকি পারিবারিক ধ্বংস " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নুসরাত জাহান, আইডিঃ 23090121725 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ফেমিনিজমের মুখোশ উন্মোচন : নারীর অধিকার নাকি পারিবারিক ধ্বংস " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

নুসরাত জাহান

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

নুসরাত জাহান

আইডিঃ 23090121725

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

পরিচিতি: 5

ফেমিনিজমের মুখোশ উন্মোচন কেন প্রয়োজন :..6

ফেমিনিজম এর পটভূমি : 7

আলোচনার সীমাবদ্ধতা : 9

নারীবাদ আসার আগে বিখ্যাত নারীদের ইতিহাস:...13

ইসলামের শুরু থেকে নারী শিক্ষার প্রচার -প্রশার:..14

বর্ণবাদ-জাতিবাদ ছেড়ে নারীবাদ কেনো:..16

পিতৃতন্ত্র (সহিংসতা নাকি সুরক্ষা): 18

ফেমিনিস্ট প্রপাগাণ্ডার ফাঁদে মুসলিম নারীরা: 20

ফেমিনিজম ধর্মবিমুখ করে দেয়: 22

ব্যভিচার ও ধর্ষণ বৃদ্ধিতে নারীবাদ: 23

কুমারী মা ও গর্ভপাত বৃদ্ধি : 27

ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামী ইস্যু: 29

জন্মনিয়ন্ত্রণ ও নারী-স্বাধীনতা:..35

ফেমিনিজম বাল্যবিবাহ বন্ধ করে কিন্তু অশ্লীলতাকে স্বাধীনতা বলে:...................38

নারীবাদের ছায়ায় ভাঙছে পরিবার: 45

বেকারত্বের হার বৃদ্ধি ও কর্মের মূ্ল্য হ্রাস:..48

সহশিক্ষায় নারীবাদের প্রভাব:..50

নারীক্ষমতায়নের প্রভাব সন্তানের উপর:..52

হিজাবি ফেমিনিস্ট : 54

ইহুদিদের চক্রান্তে নারীবাদ:...57

ইসলামে নারীর মর্যাদা :...59

পরিচিতি:

ফেমিনিজম হলো একটা রাজনৈতিক-সামাজিক আন্দোলন ও মতাদর্শ যা নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলে পুরুষের প্রতি বৈষম্য ও সামাজিক স্থিরতা নষ্ট করার জন্য কাজ করে।

যদিও নারীবাদিরা বলে তারা নারীর জন্য সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কাজ করে থাকে কিন্তু তাদের লক্ষ মুলত নারীকে ঘর থেকে বের করা এবং পুরুষবিদ্বেষী করে তুলা।

নারীর জন্য আসলে কি প্রয়োজন -সমতা নাকি ন্যযতা?!

ইসলাম নারীদের দিয়েছে সর্বোচ্চ সম্মান।
আল্লাহ পাক কুরআনে উল্লেখ করেছেন :

সূরা আল-আহযাব (৩৩:৩৩)

> **وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا**

বাংলা অনুবাদ

> **“আর তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান করো এবং পূর্বেকার জাহেলিয়াতের মতো নিজেদের প্রকাশ করো না। নামাজ কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। আল্লাহ কেবলমাত্র চান, হে আহলে বাইত! তিনি তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করবেন এবং তোমাদের পরিপূর্ণরূপে পবিত্র করবেন।**

আল্লাহ যেখানে নারীদের ঘরে থাকার কথা বলেছেন সেখানে নারীবাদিরা ঘর থেকে বের করছে।

ফেমিনিজমের মুখোশ উন্মোচন কেন প্রয়োজন :

নারীবাদীরা আসলে লিঙ্গ সমতায় নয় নারী কেন্দ্রিকতায় বিশ্বাসী।
এটা ইহুদিদের একটা চক্রান্ত মুসলিম নারীদের ঘর থেকে বের ধর্মীয় দিক থেকে দূরে রাখা।

পরিবার গুলোকে ভেঙে ফেলার জন্য তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে। দাজ্জালের অন্যতম ফেতনা হলো নারীবাদ। দাজ্জালের ফেতনাই তো সবচেয়ে ভয়ঙ্কর।

নারীবাদের সবচেয়ে বড় শিকার হলো বাচ্চারা। মায়ের যত্ন টাও ভাগে পরে না। অর্থনৈতিক, সামাজিক,ধর্মীয় এমনকি জৈবিক ভারসাম্য পর্যন্ত লঙ্ঘিত হচ্ছে এর কারণে। সন্তান মাকে পাচ্ছেনা।
স্বামী স্ত্রীর দ্বারা লাঞ্ছিত হচ্ছে। আবার নারীরাও নারীর দ্বারা হিংস্রতার শিকার হচ্ছে।
যুবক-যুবতীদের নৈতিক অবক্ষয়, কুমারী মা,ডিভোর্স বেড়ে যাওয়া,অর্থনৈতিক দ্বন্দ, কাজের মুল্য হ্রাস (পরে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে) আরও বহু সমস্যার সুচক নারীবাদ। কিন্তু তাদের সাথে আলোচনা করতে গেলে তারা স্বীকার করা তো দূর উল্টাপাল্টা আরোপ এনে আলোচনাকারীর উপরেই চড়াও হবে।
এসব থেকে আমাদের বোনদের রক্ষা করার জন্য এর মুখোশ উন্মোচন অতন্ত জরুরি।

আল্লাহ পাক কুরআন এ উল্লেখ করেছেন:

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

বাংলা অনুবাদ:

“আর আমি যাদের সৃষ্টি করেছি, তাদের মধ্যেও এমন এক দল রয়েছে যারা সত্যের দ্বারা পথ প্রদর্শন করে এবং সত্যের দ্বারা বিচার করে (ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে)।”
— [সুরা আল-আ'রাফ, আয়াত ১৮১]
এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন — প্রতিটি যুগেই এমন এক সম্প্রদায় থাকবে যারা **সত্য ও ন্যায়ের পথে** মানুষকে আহ্বান জানাবে এবং সমাজে **ন্যায় প্রতিষ্ঠা** করবে।

ফেমিনিজম এর পটভূমি :

নারীবাদের প্রাথমিক তরঙ্গ (first wave feminism) মূলত ইউরোপ ও আমেরিকায় শুরু হয় ১৯শ শতকে — তখন লক্ষ্য ছিল নারীদের ভোটাধিকার ও আইনি সমতা অর্জন।
এই আন্দোলনের নেতৃত্বে অন্যসকল কর্মীদের মধ্যে অন্যতম কিছু ইহুদি নারী চিন্তাবিদ ও কর্মী ছিলেন, যেমন:

Betty Friedan – "The Feminine Mystique" (১৯৬৩) বইয়ের লেখিকা, যিনি "second wave feminism"-এর সূচনা করেন।

Gloria Steinem – বিখ্যাত নারীবাদী ও "Ms. Magazine"–এর প্রতিষ্ঠাতা, যার পরিবারও ইহুদি বংশোদ্ভূত।

আরও কিছু নারীবাদী হিসেবে পরিচিত:
-মেরি ওলস্টোনক্র্যাফ্ট
-সিমোন ডি ওভোয়ার
-বেগম রোকেয়া
-হুমায়ন আজাদ
-অনিতা সার্কেসিয়ান
এছাড়াও আরও অনেক নারীবাদীরা আছে যারা সবাই মিলে সমঅধিকার এর নাম করে সার্বিক ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেছে।

নারীরা মুলত মায়ের জাত। তারা রাণীর মতই থাকত। কিন্তু এসব শান্তি নষ্ট করে বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে আরাম আয়েশ আর সম্মানের সহিত থাকা নারীদের যাদের দায়িত্ব ছিলো কম কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটা সমাজ গঠনে তাদের সমঅধিকার এর ভুত মাথায় চাপিয়ে দিয়েছে।

একজন নারী - একজন মা।
সে ঘরে বসে তার সন্তানদের উত্তম মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেয়।
কিন্তু এখন নারীদের সন্তানকে দেওয়ার জন্যও সময় হয় না।

নারীবাদের দ্বিতীয়- ওয়েভ শুরু হয় ১৯ শতকের মাঝে(১৯৬০-১৯৮০ পর্যন্ত) যার দাবী ছিলো চাকরি ক্ষেত্রে সমান অধিকার, গর্ভপাত ও জন্মনিয়ন্ত্রণ এর সুযোগ, আত্মনির্ভরতা।

তৃতীয় ওয়েভ (১৯৮০-২০১০) এটাই মুলত নারীবাদের সবচেয়ে জঘন্যতম ওয়েভ। এটার মুল আন্দোলন হলো সমকামীতা প্রমোট, যৌন স্বাধীনতা ও ট্রান্সজেন্ডার ইস্যু।

চতুর্থ ওয়েভ (২০১০- চলমান) এটায় নারীর প্রতি যৌন হয়রানি মুলক কর্মকাণ্ড দূর করার কথা বলা হয়।
অনলাইন প্লাটফর্মে নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে।

শুরু থেকেই পরিকল্পনামাফিক এগিয়ে যাচ্ছে নিজেদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন এর জন্য। প্রথমে ইউরোপ- আমেরিকার নারীদের নিয়ে আন্দোলন চলালেও এখন সময়ের ব্যবধানে এশিয়া আফ্রিকার নারীদেরও ব্রেইন ওয়াশ করে দিয়েছে।

আলোচনার সীমাবদ্ধতা :

নারীবাদ এততাই বিস্তৃতি লাভ করেছে যে এর বিরুদ্ধে একটা কথা বললেই দুই তিনজন প্রতিবাদ করে উঠে।
শহর তো শহর প্রত্যন্ত গ্রাম অবদি একদম মিশে গিয়েছে নারীবাদ।
গ্রামের সহজ-সরল মহিলাদের মাঝে পুরুষ বিদ্বষী মনোভাব গেথে দেওয়া হয়েছে।
তাই এর বিরুদ্ধে কিছু বলা বা করা এত সহজ নয়।
বিশেষত সেকুলার সমৃদ্ধ দেশে নারীবাদ ও সেকুলারিজম পরস্পর গভীর ভাবে সম্মিলিত।

যেখানে অধিকাংশ মানুষ সেকুলার সেখানে ফেমিনিজম শিরায় শিরায় বহমান।
এমনকি শরীয়াতের বিষয় মেনে চলা মানুষরাও নারীক্ষমতায়নে বিশ্বাসী।
নারীবাদীরা সমাজের কিছু লোকের নিচ কর্মকাণ্ডের উদাহরণ বারবার টেনে এনে সবাইকে একই ধারায় ফেমে পুরুষ ফোবিয়া ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে।

আগে নারীরা যেমন রোজগার করত না তাই তাদের দায়িত্ব কম ছিলো। সামাজিক ভাবে তাই আত্মপ্রকাশ করতে পারত না।
এটাকে তারা বৈষম্যের নাম দিয়ে নিজেদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে।

যদিও নারীবাদ বদ্ধমুল ধারণা দূর করা এত সহজ নয় তবুও চেষ্টা চালিয়ে যেতেই হবে।
ফেমিনিজম এর বিপক্ষে খুব কম সখ্যক মানুষই কথা বলেছেন এবং বলেন।
সেটাও খুব সুকৌশলে সাধারণ মানুষের থেকে চাপিয়ে রাখা হয়।

স্কুল,কলেজ এমনকি মাদ্রাসাগুলোতেও খুব কম বয়স থেকেই নারীবাদ বাচ্চাদের মস্তিষ্কে পুশ ইন করে দেওয়ার কারণে নারীবাদ ধ্যান ধারণা দূর করা অত্যন্ত কঠিন কাজ।

কিন্তু আল্লাহ চাইলে এসব কোনো ব্যাপারই না।
কেননা কুরআান মাজীদে এসেছে
সুরা ইয়াসীন — আয়াত ৮২

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

বাংলা অনুবাদ:
তিনি যখন কোনো কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন শুধু বলেন — “হও”, আর তা হয়ে যায়।

আবার হেদায়েত দানের মালিক হলেন আল্লাহ।

আল্লাহ বলেন-

সুরা আল-কাসাস — আয়াত ৫৬

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ

বাংলা অনুবাদ:

তুমি যাকে ভালোবাসো তাকে হেদায়েত দিতে পারো না, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই হেদায়েত দেন।

সুতরাং যত সীমাবদ্ধতাই থাকুক না কেন চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

আল্লাহ তাওফিক দিন।

আমিন।

ইসলামের আগে ও পরে নারীর অবস্থা:

ইসলাম নারীর ওপর কোনো জুলুম করেনি; বরং তাকে সম্মান আর নিরাপত্তার চাদর পরিয়ে দিয়েছে। নারীর মর্যাদা, অধিকার ও সম্মান—সবচেয়ে পরিপূর্ণভাবে দিয়েছে কেবল ইসলামই।

আর যারা নারীর নামে স্বাধীনতার বুলি আওড়ায়, তারা আসলে নারীকে উপভোগ্য বস্তু বানাতে চায়। তারা হিজাবের বিরুদ্ধে কথা বলে, কিন্তু নারীর শরীরকে বিজ্ঞাপনের পণ্য বানাতে দ্বিধা করে না। তারা ইসলামকে দোষ দেয় নারীর অধিকার কেড়ে নেওয়ার, কিন্তু নিজেরাই নারীর দেহের সৌন্দর্যকে বিক্রি করে বাজারে। তারা পর্দাকে বলে ‘পিছিয়ে পড়া’, আর অশ্লীলতাকে বলে ‘প্রগতিশীলতা’। তাদের কথায় মধুর আবরণ, কিন্তু ভেতরে লুকানো বিষ। তাদের ডাকে আছে মুক্তির সুর, কিন্তু গন্তব্য—চূড়ান্ত গোলামী।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

যে কেউ নেক কাজ করে—সে পুরুষ হোক কিংবা নারী—আর সে যদি মুমিন হয়, তাহলে আমি তাকে অবশ্যই একটি সুন্দর জীবন দান করব এবং তাদের কর্মফলের উত্তম প্রতিদান তাদেরকে অবশ্যই প্রদান করব, যা তারা করে গেছে। [সূরা নাহল : ৯৭]

ইসলামের আগে নারীদের কোনো সম্মান ছিল না। কন্যাসন্তান জন্ম নিলে লোকে লজ্জা পেত, মুখ লুকিয়ে বেড়াত। কেউ কেউ তো এতটাই পাষাণ ছিল যে, নিজের মেয়েশিশুকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলত!

মেয়েদের মানুষ মনে করা হতো না। একজন পুরুষ মারা গেলে তার রেখে যাওয়া সম্পদের মতোই তার স্ত্রীকেও ছেলে বা অন্য পুরুষেরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিত।

নারীর কথা তারা শুনত না। যদি কোনো নারী ভালো এবং যুক্তির কথা বলত, তাও তারা বলত, 'নারীর কথা শুনলে নাকি পুরুষের মর্যাদা নষ্ট হয়।'

তাদের দৃষ্টিতে নারীর মূল্য ছিল একজোড়া পুরোনো জুতার থেকেও কম।

এরপর দুনিয়ায় আসলেন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) এবং সাথে নিয়ে আসলেন আল্লাহর অগণিত নিয়ামত।

তিনি এমন সুসংবাদ দিলেন, যা কোনো সমাজ কখনো দিতে পারেনি।

مَن عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ، وَضَمَّ أَصَابِعَهُ

যার ঘরে দুটি কন্যাসন্তান জন্ম নেবে, আর সে যদি তাদেরকে ভালোভাবে গড়ে তোলে, ভালো শিক্ষা দেয়, আদব-আখলাক শেখায়, তবে সে জান্নাতে আমার সঙ্গে থাকবে—ঠিক যেমন দুটো আঙুল পাশাপাশি থাকে। [তিরমিযী : ১৯১৪]

তিনি আরও বললেন

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ، كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যার তিনটি কন্যাসন্তান থাকবে, আর সে তাদের বিষয়ে ধৈর্য ধরবে, খাওয়াবে, পান করাবে এবং নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদেরকে কাপড় পরাবে—তারা কিয়ামতের দিন তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে ঢাল হবে। [ইবন মাজাহ : ৩৬৭০]

আল্লাহ তাআলা নিজেও কুরআন মজিদে জানিয়ে দিলেন

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً

যে কেউ নেক কাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, যদি সে মুমিন হয়, তবে আমি তাকে পবিত্র, সুন্দর জীবন দান করব। [সূরা নাহল : ৯৭]

এই আয়াত নারীদের জন্য যেন এক শান্তির বার্তা। কেননা জাহেলি যুগ বলেছিল, নারী তুচ্ছ! কিন্তু আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিলেন— নারীও আল্লাহর প্রিয় হতে পারে। পুরুষের মতো নারীও হতে পারে আল্লাহর ওলী, জান্নাতি, প্রিয়তমা বান্দী। নারীর হৃদয়েও জ্বলে উঠতে পারে আল্লাহর প্রেমের দীপ্তি। নারীত্ব কোনো বাধা নয়; বরং ঈমান আর আমলই আসল পরিচয়।

এভাবে ইসলাম নারীদের এমন সম্মান দিয়েছে—যা কোনো সভ্যতা, কোনো দীন, কোনো সমাজ কখনো দিতে পারেনি।

নারীবাদ আসার আগে বিখ্যাত নারীদের ইতিহাস:

প্রথম উদাহরণ আফ্রিকার দেশ মিশর থেকে। প্রাচীন শাসকদের মধ্যে মিশরের রানি ক্লিওপেট্রা ছিলেন পৃথিবী বিখ্যাত।

প্রকৃতপক্ষে মিশরের সাতজন রানির নাম ছিল ক্লিওপেট্রা। যদি সেখানে আদৌ পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থাকত, তাহলে সাতজন রানির মধ্যে কেউ কি সর্বোচ্চ শাসক হতে পারত?!

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো- উক্ত সাতজন ছাড়াও আরও অনেক রানি পেয়েছিল মিশর। বলা দরকার, দেশটি বরাবরই ছিল নারী শাসকদের জন্য সুবিদিত। মিশরের অষ্টাদশ রাজবংশের পঞ্চম ফারাও হাতশেপসুত ছিলেন একজন নারী।

১৯১৩ সালে প্রকাশিত ক্যাথলিক এনসাক্লোপিডিয়া জানাচ্ছে একজন স্প্যানিশ নারী জুলিয়ানা মরেল মাত্র চার বছর বয়সে গ্রীক,ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষা শিখতে শুরু করেন।

পরিবর্তি সময়ে তিনি পদার্থবিজ্ঞান, দর্শন শাস্ত্র, নাগরিক আইন ও ধর্ম শাস্ত্রে বিস্তারিত তালিম নেন। ১৬০৮ সালে জুলিয়ানা যখন আইনে তার প্রথম ডক্টরেট ডিগ্রীটা অর্জন করেন, তখন তার বয়স ছিলো মাত্র ১৪ বছর।

সেসময় যদি নারী নিপিড়নকারী পুরুষতান্ত্রিকতা থাকত।, তাহলে সে কখনোই প্রতিষ্ঠিত হতে পারত না। তিনি মুলত নিপিড়ীত ছিলেন না, ' পরিশ্রম করেছিলেন এবং সেই পরিশ্রম বৃথা যায়নি।

১৬৬৩ সালে L'Ecole des Ursulines de Quebec নামে একটি বালিকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিলো যা এখনো চলমান যেখানে একচেটিয়া মেয়েদের শিক্ষার উপর গুরুত্বআরোপ ছিলো।

সেখানে ছেলেদের প্রবেশাধিকার ছিলোনা।

এই কলেজ গুলো এখনো চলমান আছে যেখানে পিতৃতান্ত্রিকতার কোনো স্থান নেই।

শাসন কাঠামো ও অর্থনীতির মত শিক্ষাক্ষেত্রেও নারীদের অংশগ্রহণের ইতিহাস বেশ পুরাতন।

১৮৩৩ সালের ১ম দিকে ওবার্লিন কলেজে মেয়েদের ভর্তির অনুমতি ছিলো।

১৮৪০ সালপর জুলাই মাসে প্রথম নারী হিসেবে স্নাতক ড্রিগ্রী অর্জন করেন ক্যাথলিন ব্রিওয়ার।

১৮৬২ সালে আফ্রো- অ্যামেরিকান নারী হিসেবে বেচেলর সম্পর্ণ করেন ওবার্লিন কলেজের মেরি জেন পিটারসন।

১৮৭৭ সালে হেলেন ম্যাগিল বোস্টন ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি অর্জন করেন।

এসব ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ১৯০০ সালের আগেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীরা অনেক সফলতা অর্জন করেছে। আবার কিছু ক্ষেত্রে পুরুষ থেকেও বেশি সাফল্য পেয়েছে।

তাহলে নারীবাদীরা কিসের বৈষম্যের কথা বলে?!!

ইসলামের শুরু থেকে নারী শিক্ষার প্রচার -প্রশার:

কুরআনে এসেছে -

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ<

"বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না — তারা কি সমান?" (সূরা যুমার ৩৯:৯)

ইসলাম নারীকে শুধু ইবাদতের অধিকারই দেয়নি, বরং জ্ঞান অর্জনের দায়িত্বও দিয়েছে — "**علم অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ ও নারীর জন্য ফরজ**" (ইবনে মাজাহ)।

নবী যুগে (Prophetic Era)

হযরত আয়েশা (রাযি.)

- ইসলামের ইতিহাসে **সবচেয়ে শিক্ষিত ও জ্ঞানী নারী** হিসেবে বিবেচিত।
- তিনি কুরআন, হাদীস, ফিকহ, চিকিৎসা, আরবি সাহিত্য—সব বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন।
- প্রায় **২২০০+ হাদীস** তিনি বর্ণনা করেছেন।
- বহু সাহাবী ও তাবেঈন তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করতেন — যেমন উরওয়া ইবনে যুবায়ের, আবু হুরায়রা (রা), ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখ।

উম্মে সালামা (রাযি.)

- নবী (সা.)-এর স্ত্রীদের মধ্যে আরেকজন আলেমা।
- অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন ও ইসলামি আইন নিয়ে পরামর্শ দিতেন।
- ফিকহ ও নারী বিষয়ক প্রশ্নে তাঁর মতামতকে সম্মান করা হতো।

শিফা বিনতে আবদুল্লাহ (রাযি.)

- নবী (সা.) তাঁকে **লেখাপড়া শেখানোর অনুমতি দেন** এবং মদীনায় অন্যান্য নারীদেরও পড়াতে উৎসাহিত করেন।
- তিনি ছিলেন **প্রথম নারী শিক্ষক**দের একজন।

উম্মে দারদা (রাযি.)

- তিনি ফিকহ ও হাদীসে বিশেষজ্ঞ ছিলেন।
- দামেস্ক ও জেরুজালেমে বহু পুরুষ আলেম তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতেন।

খলাফায়ে রাশেদীন যুগে

- হযরত আয়েশা (রা.) ও অন্যান্য নারী সাহাবারা **নারী ও পুরুষ উভয়ের শিক্ষক** হিসেবে কাজ করেছেন।
- উমর (রা.)-এর সময় নারীরা মসজিদে গিয়ে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করতেন।
- মেয়েদের শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ দেওয়া হতো।

উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে (৭ম–১৩শ শতাব্দী)

- নারী আলেম, কবি, ও পণ্ডিতদের সংখ্যা বাড়তে থাকে।
- নারী মুফাসসিরা ও মুহাদ্দিসারা (হাদীস বিশারদ) সমাজে বড় ভূমিকা রাখেন।

উদাহরণ:

✿ **ফাতিমা আল-ফিহরি (মরক্কো)**

- **৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন "আল-কারাওইয়িন বিশ্ববিদ্যালয়",** যা আজও বিশ্বের **প্রথম ও প্রাচীনতম কার্যকর বিশ্ববিদ্যালয়** হিসেবে পরিচিত।
- এটি নারী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যেখানে ইসলামি ও বিজ্ঞান শিক্ষা দুটোই দেওয়া হতো।

✿ **কারামাত বিনতে আহমদ (১১শ শতাব্দী)**

- তিনি হাদীস শিক্ষা দিতেন এবং দামেস্কে বহু ছাত্র তাঁর কাছ থেকে "ইজাযাহ" (শিক্ষাগত অনুমোদন) নিতেন।

✿ **জয়নাব আল-মাকদিসিয়া, আমিনা বিনতে আবদুল্লাহ**

- তাঁরা বিখ্যাত **মুহাদ্দিসা (হাদীস শিক্ষক)** ছিলেন।
- তাঁদের কাছ থেকে পুরুষ আলেমরাও শিক্ষা গ্রহণ করতেন।

আন্দালুস (স্পেন) ও ইসলামি স্বর্ণযুগ

- মুসলিম স্পেনে মেয়েরা গণিত, দর্শন, চিকিৎসা, কবিতা ও আইন বিষয়ে শিক্ষালাভ করত।
- **ওয়ালাদা বিনতে আল-মুস্তাকফি** ছিলেন কবি, শিক্ষিকা ও রাজদরবারের পণ্ডিতা।
- নারীরা "মাদ্রাসা" ও "বায়তুল হিকমা"-র মতো প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করতেন।

এরকম শত শত উদাহরণ রয়েছে। নারীবাদীদের দাবী কি আসলেই কোনো যৌক্তিকতা রয়েছে!??

বর্ণবাদ-জাতিবাদ ছেড়ে নারীবাদ কেনো:

পশ্চিমারা তাদের বর্ণবাদ,জাতিবাদ প্রথাকে সংশোধন না করে নারী সমতার বুলি আওড়ায় কেনো?

তারা যে কতটা নিষ্ঠুর তার একটা ছোট্ট উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো:

কিং বিলি-

তাসমানিয়া দ্বীপের শেষ আদিবাসী পুরুষ তিনি। পশ্চিমারা এই জাতি ও জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

কিং বিলি নামটি দেওয়া হয়েছিল বিদ্রূপ করে। তার প্রকৃত নাম ছিল উইলিয়াম ল্যানি। জন্ম আনুমানিক ১৮৩৫ সালে, তাসমানিয়া দ্বীপে। তখন দ্বীপের নাম ছিল ভ্যান ডিমেনস ল্যান্ড।

এই আদিবাসীরা ছিল শান্তিপ্রিয়। তারা যুদ্ধ বা অস্ত্র চিনত না। তাদের একমাত্র চাওয়া ছিল "আমাদের শান্তিতে থাকতে দাও"।

কিন্তু যখন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা এল, তারা ঘোষণা দিল, এই দ্বীপে কেউ নেই! শুরু হলো ১৯ শতকে এক ভয়ংকর গ.ণ.হ.ত্যা, যা পরিচিত "কালো যুদ্ধ" নামে।

আদিবাসীদের জমি থেকে উৎখাত করা হলো। পুরুষদের হ.ত্যা. করা হলো ।

নারী ও শিশুদের বন্দি করে পাঠানো হলো কথিত সভ্যতা শিবিরে।

সেখানে তারা মারা গেল নির্যাতন, রোগ ও অপুষ্টিতে।

উইলিয়াম ল্যানি ছিলেন সেই অল্প কয়েকজন শিশুর একজন, যিনি এই গ.ণ.হ.ত্যা থেকে বেঁচে যান। তাকে পাঠানো হয় ফ্লিন্ডার্স দ্বীপে, যেখানে তাকে "সভ্যতা ও উন্নয়ন" কর্মসূচির আওতায় রাখা হয়।

তিনি দেখলেন, তার জাতির সংখ্যা ১৫,০০০ থেকে কমে, মাত্র কয়েকজন হয়ে গেছে, শেষে শুধু তিনিই রইলেন।

পরে তিনি হোবার্ট শহরে চলে আসেন, সেখানে তিনি নাবিক হিসেবে কাজ করেন। ইউরোপীয়রা তাকে দেখতে লাগল এক "অন্যরকম" মানুষ হিসেবে- যাকে "নমুনা" হিসেবে সংরক্ষণ করার চিন্তা করল তারা।

তাকে দেওয়া হলো একটি ব্যঙ্গাত্মক উপাধি, কিং বিলি।

১৮৬৯ সালের ৩ মার্চ, মাত্র ৩৪ বছর বয়সে তিনি মারা যান। সম্ভবত যক্ষ্মা বা নিউমোনিয়ায়। কিন্তু মৃত্যুর পরও তার প্রতি অবমাননা থামেনি। তার দেহ নিয়ে শুরু হয় লড়াই- হোবার্টের ব্রিটিশ রাজকীয় জাদুঘর এবং স্থানীয় মেডিকেল কলেজের মধ্যে।

কে পাবে তার দেহ?

পরে তার মাথা কে.টে. নেওয়া হয়। চুরি করা হয় তার খুলি ও যৌ.না.ঙ্গ। তথাকথিত "নৃবিজ্ঞান" গবেষণার নামে। যা ছিল বর্ণবাদী শ্রেষ্ঠত্ব তত্ত্বের অংশ।

তাসমানিয়ার সরকার এখনও তাকে সম্মানের সাথে পুনঃসমাধিস্থ করার প্রচেষ্টা করছে ।

ভাবা যায় কতটা নিষ্ঠুর!! শুধু কি এগুলো?

১৬ সাল থেকে প্রায় ১.২-১.৩ কোটি আফ্রিকানদের জাহাজ পথে ইউরোপ নিয়ে দাস হিসেবে বেঁচে দেওয়া হয়। যেতে যেতেই ২০-২৫ লাখ মানুষ মারা যায়।

জার্মান সেনারা আফ্রিকার Herero & Nama জনগোষ্ঠীর ৮০% মানুষ মেরে ফেলে।

১৯০০ এর শুরুর দিকে আরও ১ কোটি আফ্রিকান দের মেরে ফেলে তৎকালীন বেলজিয়ামের রাজা।

১৮০০ এর দিকে আমেরিকার আদিবাসী নিধন তো সবার জানা।

কালো মানুষরা তো অশুচি শেতাঙ্গদের কাছে। সাদা মানুষদের জন্য আলাদা স্কুল,কলেজ ও হসপিটাল থাকলেও কালোদের জন্য মৌলিক প্রয়োজন ও মিটাবার রাস্তা নেই। যুক্তরাষ্ট্রে এখনো কালোদের বিরুদ্ধে পুলিশের সহিংসতা জারি আছে। আর ইউরোপ এর দেশগুলোতে মুসলিম ও কালোদের বিরুদ্ধে ঘৃণা বেড়েই চলছে।

এসব বর্ণবাদ এর বিরুদ্ধে আন্দোলন না করে নারীবাদীরা কিসের সমতার কথা বলে?!

পিতৃতন্ত্র (সহিংসতা নাকি সুরক্ষা):

পিতৃতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে এর পরিচয় জেনে নেওয়া উচিত। মেরিয়াম ওয়েবস্টার-এ পিতৃতন্ত্র সম্পর্কে বলছে-

'এমন সামাজিক কাঠামো, যেখানে বংশ বা পরিবারে পিতার আধিপত্য থাকে, স্ত্রী ও সন্তানরা আইনিভাবে পিতার ওপর নির্ভরশীল এবং পিতৃগোত্র থেকে বংশ ও উত্তরাধিকার নির্ণয় করা হয়।'

আল্লাহ পাক নারীদের দায়িত্ব পুরুষদের উপর দিয়েছেন।

কুরআনুল কারীমে এসেছে-

আন-নিসা (৪:৩৪)

> **الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ**

"পুরুষরা নারীদের উপর দায়িত্বশীল (অভিভাবক ও রক্ষণাবেক্ষণকারী), কারণ আল্লাহ একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং তারা তাদের সম্পদ ব্যয় করে।"

(সূরা আন-নিসা, আয়াত ৩৪)

পুরুষেরা নারীদের উপর কৃর্তত্বশীল এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সে মতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোক চক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাযত করে। আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সবার উপর শ্রেষ্ঠ।

আবার হাদীসে আছে-

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫১৮৬)

> **রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:**

"পুরুষ তার পরিবারের নেতা, এবং তার দায়িত্ব পরিবারের ওপর। নারী তার স্বামীর ঘর ও সন্তানদের নেতা, এবং সে তাদের জন্য দায়িত্বশীল।"

ইসলামে নারী হলো ঘরের রাণী। সে অতি সম্মানিতা। তাই তার ভরণপোষণের জন্য বাইরে কাজ করতে যাওয়ার জরুরত নেই। তার জন্য শরীয়াহ পুরুষের উপর দায়িত্ব দিয়েছে।

একজন পুরুষ বাইরে কাজ করবে, সংসারের জন্য রুজির ব্যবস্থা করবে। সামাজিক, অর্থনৈতিক ভাবে নারীদের সুরক্ষা প্রদান করবে।

স্বভাবতই সে চাইবে তার ঘরের নারী তার জন্য নিবেদিত থাকুক। কিন্তু নারীবাদ এমন করে মেয়েদের মগজ ধোলাই করেছে যে তারা স্বামী,ভাই এমনকি বাবার কথাও মানতে নারাজ।

যখন কোনো পুরুষ তার ঘরের নারীদের বাইরে যাওয়া থেকে মানা করে তারা ভাবে এটা তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। তারা এটা চিন্তা করে না বাইরের কঠোর ও বিপদজনক পরিস্থিতি থেকে বাঁচানোর জন্য তাদের মানা করা হচ্ছে।

নারীর ভরণপোষণের দায়িত্ব যখন পুরুষের উপর দেওয়া হয়েছে তখন নারীর বাইরে যাওয়ার দরকার কোথায়?!

নারীরা ঘরের থাকবে, বাচ্চাদের দেখাশুনা করবে, দ্বীনি ইলম হাসিল করবে। এর বিনিময়ে পাবে সামাজিক নিরাপত্তা,অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, সম্মান ও মর্যাদা। এবং এর বদৌলতে যদি পুরুষরা সংসারে তাদের আধিপত্য দেখায় তাহলে সেটা কি করে নারীর প্রতি সহিংসতা হয়?!

নারীবাদীরা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে যে প্রপাগান্ডা চালাচ্ছে এর পরিণাম খুব একটা সুখকর নয়।

নারীর প্রতি সহিংসতার কথা বলে তারা যখন ইচ্ছা তখন সঙ্গীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করছে। পুরুষরা বাইরের সব করে ঘরে এসে যদি খাবার চায় সেটাও নাকি জুলুম হয়ে যায়। মতের মিল না হওয়ার কারণে মন চাইলেই মামলা ঠুকে দেয়। বর্তমান আইন যেহেতু নারীর পক্ষে সুতরাং নারী যা খুশি করতে পারবে।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় তারা নিজেদের বন্দী মনে করে। পুরুষদের হেয় প্রতিপন্ন করা এবং সামাজিক ভাবে তাদের বদনাম করার জন্য তারা প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালাচ্ছ।

এসব আচরণের কারণে পুরুষদের আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়েই চলছে। মানসিকভাবে ভংগুর হয়ে পরছেন। মাদক এবং অন্যান্য অপরাধ মুলক কর্মকাণ্ডে জরিয়ে পড়ার প্রবণতাও কয়েকগুণে বেড়ে যায়।

অর্থাৎ যে সুরক্ষা দিচ্ছে তাকেই ভেংগে চুড়ে দেওয়া হচ্ছে।

ফেমিনিস্ট প্রপাগাণ্ডার ফাঁদে মুসলিম নারীরা:

প্রপাগাণ্ডা আসলে কি? প্রপাগান্ডা হলো-

প্রোপাগান্ডা হলো কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপকার, ক্ষতি কিংবা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে কোনো ধারণা, তথ্য বা গুজব ছড়িয়ে দেওয়া অথবা এ জাতীয় প্রভাব ফেলতে সক্ষম যেকোনো কার্যক্রম পরিচালনা করা।'

ইতিহাসের পুরোটা সময়জুড়ে জনসম্মুখে আলোচিত হয়েছে, এমন প্রায় প্রতিটি ইস্যুই প্রোপাগান্ডার আওতাভুক্ত। ফেমিনিজমের মধ্যে নারীর ক্ষমতায়ন বলতে যে বিষয়টা আছে, তা বাদ দিয়ে নারীবাদ সম্পর্কে যেকোনো আলোচনাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

প্রথম দিকের নারীবাদীদের দাবী সত্য ছিলো যে নারীদের পুরুষদের মত অধিকার ছিলো না। কিন্তু মুদ্রার এপিঠের কথা বললেও ওপিঠের কথা তারা কোনোদিন বলেনা। সন্তান লালন-পালন এবং পরিবার ব্যবস্থাপনা বাদ দিয়ে সার্বিকদিক কিন্তু পুরুষরাই সামলাতো। নারীদের রাখা হতো ঘরের রাণী হিসেবে।

আজকের দুনিয়ায় ইসলামবিরোধী শক্তিগুলো শুরু করেছে এক নতুন খেলা। তাদের অভিযোগ—ইসলাম নাকি নারীর ওপর বাড়াবাড়ি রকমের নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দিয়েছে! এই বলে তারা মুসলিম নারীদের মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয়, উসকে দেয় বিদ্রোহের আগুন।

দুঃখের বিষয় হলো, মুসলিম অনেক বোনই এসব প্রোপাগান্ডায় প্রভাবিত হয়ে পড়ে। ভাবতে শুরু করে, তাদের কি সত্যিই তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে?

কিন্তু তারা বুঝে না—এই কথাগুলোর পেছনে কী ভয়ংকর ফাঁদ লুকিয়ে আছে।

বাস্তবতা হলো, ইসলাম নারীর ওপর কোনো জুলুম করেনি, বরং তাকে সম্মান আর নিরাপত্তার চাদর পরিয়ে দিয়েছে। নারীর মর্যাদা, অধিকার ও সম্মান—সবচেয়ে পরিপূর্ণভাবে দিয়েছে কেবল ইসলামই।

আর যারা নারীর নামে স্বাধীনতার বুলি আওড়ায়, তারা আসলে নারীকে উপভোগ্য বস্তু বানাতে চায়। তারা হিজাবের বিরুদ্ধে কথা বলে, কিন্তু নারীর শরীরকে বিজ্ঞাপনের পণ্য বানাতে দ্বিধা করে না। তারা ইসলামকে দোষ দেয় নারীর অধিকার কেড়ে নেওয়ার, কিন্তু নিজেরাই নারীর দেহের সৌন্দর্যকে বিক্রি করে বাজারে। তারা পর্দাকে বলে 'পিছিয়ে পড়া', আর অশ্লীলতাকে বলে 'প্রগতিশীলতা'। তাদের কথায় মধুর আবরণ, কিন্তু ভেতরে লুকানো বিষ। তাদের ডাকে আছে মুক্তির সুর, কিন্তু গন্তব্য—চূড়ান্ত গোলামী। তারা চায় না কেউ সুখে শান্তিতে সংসার করুক। ঘর থেকে বের করে নারীদের অন্যের চোখের খোরাকে পরিণত করেছে। অবৈধ সম্পর্ককে স্বাভাবিক করে তুলেছে। কুমারী মা এবং পরিকিয়া কে নারীর ইচ্ছাতে পরিণত করেছে।

শাইখুল ইসলাম মুফতি তাকী উসমানী কত সুন্দর করে বলেন, এই যুগে একটা ভয়ানক ভুল চিন্তা মানুষের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়, নারী যদি ঘরে থেকে স্বামী-সন্তান, মা-

বাবা আর ভাই-বোনের জন্য রান্না-বান্না করে, ঘর গুছিয়ে রাখে, তাহলে এটা নাকি অপমান আর বন্দিত্ব!

কিন্তু সে নারী যদি পরপুরুষের খাবার রান্না করে, হোটেল বা উড়োজাহাজে তাদের আপ্যায়নে ব্যস্ত থাকে, দোকানে মিষ্টি হাসি দিয়ে গ্রাহককে আকৃষ্ট করে, অফিস-আদালতে বসদের মনোরঞ্জনে লিপ্ত হয়, তাহলে সেটাই হয়ে যায় 'মর্যাদা' ও 'স্বাধীনতা'! ইন্নালিল্লাহি ...

আরো বিস্ময়ের বিষয় হলো, এই তথাকথিত আধুনিক নারী বাইরে আট ঘণ্টা চাকরি করে আর ঘরে ফিরে আগের মতোই রান্না, ধোয়া-মোছার দায়িত্ব পালন করে। এই কি স্বাধীনতা? নাকি দ্বিগুণ পরিশ্রমের বন্দিত্ব?

ইউরোপ-আমেরিকার বহু নারী আজ এই দমবন্ধকরা চক্রে পিষ্ট হচ্ছে।

ইসলাম কখনো নারীদের কাঁধে উপার্জনের দায়িত্ব দেয়নি। মেয়ে হলে—তার খরচ চালাবে বাবা। বোন হলে—দেখভাল করবে ভাই। স্ত্রী হলে—সব খরচের দায়িত্ব স্বামীর। আর মা হলে—তার খরচ চালাবে সন্তান।

মানে, মেয়েটা জীবনের কোনো সময়েই নিজের আয় দিয়ে চলার কষ্ট পাবে না। সব সময়ই কোনো না কোনো আপন পুরুষ তার দায়িত্ব নেবে।

ইসলাম বলে, নারীরা ঘরের রাণী। পুরুষরা ঘাম ঝরিয়ে কামাই করে তাদেরকে দিবে। নারীরা শুধু সন্তানদের লালন-পালন করবে। ঘরকন্নার কাজ সামলাবে। আপনারা নিজেরাই বিচার করুন, নারীদেরকে প্রকৃত মর্যাদা কে দিয়েছে? ইসলাম নাকি পাশ্চাত্য সমাজ?

ফেমিনিজম ধর্মবিমুখ করে দেয়:

নারীবাদীরা শুধু সামাজিক অধিকার নয়, ধর্মীয় কাঠামোকেও পুরুষতান্ত্রিক বলে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। যারাই নারীবাদের কবলে পরেছে তারাই ধীরে ধীরে ধর্মীয় মুল্যবোধ থেকে দূরে সরে গেছে।

ইসলামে নবী-রাসুল, খলিফা, ইমাম হয় পুরুষ। এর কারণে হিংসাবশত নারীবাদীরা ধর্ম থেকে দূরে সরে যায়।

শুধু তাই নয়, ইসলামের মৌলিক ও ফরজ বিধানকেও ত্যাগ করে অহং বশত।

মুসলিম ব্যতীত অন্য ধর্মের ক্ষেত্রেও ঘটেছে একই ঘটনা। ফেমিনিস্ট আন্দোলনের প্রসারের পর নারীদের মধ্যে চার্চ, মসজিদ বা ধর্মীয় সংগঠনে অংশগ্রহণের হার কমে গেছে।

Linda Woodhead (Oxford Journal of Sociology of Religion, 2017)–এর গবেষণায় বলা হয়-

"Feminism has transformed women's moral worldviews, replacing religious obedience with personal autonomy."

(ফেমিনিজম নারীর নৈতিক চিন্তাকে বদলে দিয়েছে; ধর্মীয় আনুগত্যের জায়গায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বসিয়েছে।)

অনেক নারীবাদীরা নিজেকে নিজের নিয়ন্ত্রক মনে করে। **My body, My choice** এই স্লোগান দেয় তারা। অথচ আমাদের দেহ আমাদের নিকট রবের দেওয়া আমানত মাত্র।

অনেকে তো সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করে। কোনো ধর্মীয় আদেশ-নিষেধ মানতে বাধ্য নয় মনে করে। Self as god ধারণায় বিশ্বাসী।

ধর্মবিমুখতার সাথে সাথে আরও বহুমুখী সমস্যার সৃষ্টি হয়। পর্দাহীনতা, নাস্তিকতা, ডিভোর্স, সন্তান লালন-পালন এ অনিহা, আত্নকেন্দ্রীকতা এবং পুরুষ বিদ্বেষ এসব সমস্যা তৈরি হয়।

Saba Mahmood (UC Berkeley) তাঁর গবেষণায় (Politics of Piety, 2005) বলেন:

"Secular feminism, when applied in Muslim contexts, often alienates women from their own faith traditions."

(ধর্মনিরপেক্ষ ফেমিনিজম মুসলিম নারীদের নিজেদের ধর্মীয় ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।)

ব্যভিচার ও ধর্ষণ বৃদ্ধিতে নারীবাদ:

ইসলাম মানুষকে অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। রাসুল (সা:) বলেছেন-
'যে ব্যক্তি অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত প্রস্তুত করবেন।'
সহীহ বুখারী:হাদিস-৬২৬৫

সামাজিক হোক কিংবা ধর্মীয় দিক হোক অশ্লীলতা কখনোও কাম্য নয়। নারীবাদ আত্নকেন্দ্রিক করে তোলে। ধর্মীয় মুল্যবোধের কোমো তোয়াক্কা করেনা। সামাজিক মুল্যবোধের কোনো ধার ধারে না।ঝ

নিজের শরীর প্রদর্শনের মাধ্যমে অন্যের মনের ও চোখের খোরাক মেটায়। নিজেকে অন্যের সামনে পন্য হিসেবে উপস্থাপন করতেও পিছপা হয় না। টিভি, ইন্টারনেট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, বিলবোর্ড সব জায়গাতেই দেহ প্রদর্শনী বিদ্যমান।

নারীবাদীরা নারীর শরীরকে এতটাই উম্মোচন করে দিয়েছে যে এখন যুবক সমাজ যারা দৃষ্টির হেফাজত করতে পারেনা তাদের কাছে যেকোনো নারীই উপভোগ্য পন্য। তাই তো এসব হায়েনাদের থেকে ছোট শিশুরাও রক্ষা পাচ্ছেনা।

আবার নারীবাদীরা যেহেতু আত্নকেন্দ্রীক হয়। নিজের মতের উপর কোনো কিছুর তোয়াক্কা করেনা। তাই তাদের যখন খুশি তারা যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে। তাদের কোনো পুরুষ কে ভালো লাগল তার সাথে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে যায়। বিশেষত এলিট ক্লাস বিজনেস ম্যান এবং তাদের ছেলেরা এদের টার্গেট হয়। যারা ইচ্ছা মত টাকা উড়াইতে পারবে ওসব নারীর পিছনে। নাইট ক্লাব গুলোতে সেজেগুজে ওত পেতে থাকে এক শ্রেণির নারী। সুযোগ মত শিকারকে নিজের রুপের জ্বালে ফাঁসায়। এই পুরুষদের অধিকাংশই বিবাহিত হয় তাই এধরনের সম্পর্ককে তারা গোপন রাখতে চায়। আর এটারই সুযোগ নিয়ে ব্যাকমেইল করে ইচ্ছা মত টাকা হাতিয়ে নেয়। যখন টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানায় তখনই ধর্ষণ মামলা করে দেয় তার বিরুদ্ধে।

এক ধরনের নারীবাদীর এটা পেশা হয়ে গেছে। তারা এত মিথ্যা ধর্ষণ মামলার হাইপ উঠিয়েছে যে সত্যিকার ধর্ষিত নারীদের সমাজ বাঁকা চোখে দেখে। ন্যায় বিচার পাওয়া তো দূর ধর্ষিতার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলে সমাজ।

আবার আরেক ধরনের নারী রয়েছে যারা টাকার বিনিময় ছাড়াই যৌন সম্পর্কে জড়ায়। সে কোনো ছেলের সাথে প্রেমের সম্পর্কে গেছে। এখন তারা নিজেদের ইচ্ছা মত যা খুশি করতে পারবে। কারণ এটা তার জীবন তার ইচ্ছা। অথচ নবী (সা:) বলেছেন-
"একজন বিশ্বাসীকে উচিত যে, সে অশ্লীল ও লজ্জাজনক কাজ থেকে দূরে থাকে।"
মুসলিম-২৯৪৬

আরেকটা নিকৃষ্ট যৌনচার হলো পর্নোগ্রাফি। নাউজুবিল্লাহ। স্মার্টফোনের এই যুগে এই ব্যাপার এতটাই সহজলভ্য হয়েছে যে স্কুলের ছেলে মেয়েরাও এসবে আসক্ত হয়ে পরেছে। নৈতিক

অবক্ষয় হচ্ছে সমাজের উঠতি বয়সিদের। এসব দেখে তারা নিজেদের উপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে। যৌবিক চাহিদা পুরণের জন্য নিষিদ্ধ পন্থা অবলম্বন করছে। হয় নিষিদ্ধ পল্লিতে যাচ্ছে নয়ত কোনো ভালো ঘরের নারী বা শিশুর উপর হামলে পরছে।

কিন্তু এত কিছুর পরেও দোষ পুরুষ ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের। কারণ নারীবাদীদের বিরুদ্ধে কিছু বললেই তারা অযথা চিল্লাচিল্লির সাথে একটাই বুলি আওড়াবে তার দেহ তার ইচ্ছা।

শুধু এই দেশ না বরং খিলাফত ছাড়া বেশির ভাগ দেশেই আইন নারীবাদীদের পক্ষে।

বাংলাদেশ আইনে **১৬ বছরের নিচের** বয়সী মেয়ের সাথে যৌন সম্পর্ক **সম্মতিতে** হলেও ধর্ষণ হিসেবে ধর্তব্য হয়।

বাংলাদেশ দণ্ডবিধি আইনের ৪৯৭ ধারায় ব্যভিচারের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

“যদি কোনও ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির স্ত্রী অথবা যাকে সে অপর কোনও লোকের স্ত্রী বলে জানে বা তার অনুরূপ বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে এমন কোনও নারীর সঙ্গে উক্ত নারীর স্বামীর সম্মতি বা সমর্থন ব্যতিরেকে এরূপ যৌন সম্পর্ক করে যা নারী ধর্ষণের শামিল নহে, সে ব্যক্তি ব্যভিচারের অপরাধে দোষী এবং যেকোনও বিবরণে কারাদণ্ডে যার মেয়াদ পাঁচ বছর পর্যন্ত হতে পারে অথবা অর্থ দণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে। **তবে ব্যভিচারে অংশগ্রহণকারী নারী দুষ্কর্মের সহায়তাকারিণী হিসেবে দণ্ডিত হবে না**”।

এখানে নারীবাদীর পক্ষেই রয়েছে সব বিষয়। যেমনঃ

-অন্যের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার নিষিদ্ধ। কিন্তু অবিবাহিত হলে বা বিধবা হলে ব্যভিচার কোন অপরাধ নয়।

-স্বামীর অনুমোদনে বা সমর্থনে ব্যভিচার করলে তা কোন অপরাধ নয়।

-ব্যভিচারী হিসেবে সাজা পাবে কেবল পুরুষ।

-ব্যভিচারে নারী প্ররোচিতকারীনী হলেও কোন অপরাধ বলে গণ্য হবে না।

- ব্যভিচারবিরোধী বাংলাদেশের আইনে স্ত্রী ব্যভিচারী স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করতে পারেন না, তেমনি স্বামীও স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারেন না। কেননা আইন কেবল নারীর স্বামীকে ব্যভিচারের পুরুষ সঙ্গীর বিরুদ্ধে মামলা করার অধিকার দিয়েছে।

কেবলমাত্র পুরুষ সঙ্গীর বিরুদ্ধে মামলা করার সুযোগ থাকায় এটি সংবিধানের ২৭ ও ২৮ অনুচ্ছেদের সমতার বিধান লংঘন করেছে। ২৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ‘সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।’ আর ২৮ (১) অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে, ‘কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনও নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।’

নারীর পক্ষে যদিও এত আইন রয়েছে তবুও যারা সত্যই ধর্ষিত হচ্ছে তারা ন্যায় বিচার পায় না। সাম্প্রতিক একটা ঘটনা হলো গাজীপুরের টঙ্গীতে মাদ্রাসায় পড়ায়া ১৩ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণ করেছে এক হিন্দু লোক। এই ইস্যুতে মেইন স্ট্রিম মিডিয়া, সেকুলার, নারীবাদী সবাই চুপ। নারীবাদীরা এখন বোবা হয়ে গেছে কেননা মেয়েটা মাদ্রাসায় পড়ে,

ইসলাম মেনে চলা পরিবার। বিশেষত অভিযুক্ত একজন হিন্দু। যেখানে ফেমিনিস্ট দের কথা একজন নারী যদি মাতাল অবস্থাতে কারো সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে এতেও নারী ধর্ষিত হয়। তাহলে ১৩ বছরের এক কিশোরীকে টানা তিন দিন অপহরণ করে রেখে তার সম্ভ্রমহানী করল সেটা কি? উপরন্তু পুলিশ তাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজ থেকে পোস্ট করেছে মেয়েটার সাথে নাকি হিন্দু ছেলের প্রেমের সম্পর্ক ছিলো!!.. Ridiculous...
দেশের আইনেও তো ১৮ বছরের আগে সবাই শিশু। ১৮ বছর হইতে একদিন কম থাকলে সেই মেয়েদের বিয়ে দিতে গেলে সব ম্যাজিস্ট্রেট, বামপন্থী, নারীবাদীরা ঝাপায়ে আটকায়। তাহলে এখন চুপ কেনো???!! এরা আসলে ইসলামপর বিরুদ্ধে। যদি মুসলিম মেয়ের জায়গায় হিন্দু বা অন্যকোনো ধর্মের কেউ থাকত তাহলে চিত্রই পাল্টে যেত।
ইসলাম মানুষের জীবনাচার সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করার জন্য দুই প্রকারের আইন আরোপ করেছে। এক প্রকার আইন হল, যা প্রয়োগ হবে দুনিয়াতে। আরেক হল, আখেরাতে। অন্য শব্দে বললে, অপরাধ দমনে এক ধরণের শাস্তি দিয়েছে দুনিয়াতে, আরেক প্রকার শাস্তি রেখেছে আখেরাতে।
ব্যভিচার একটি সামাজিক ব্যাধি। যার মাধ্যমে পারিবারিক জীবন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পরে। সামাজিক জীবনে নেমে আসে বিশৃঙ্খলা। সেই সাথে নানাভিদ যৌনবাহিত রোগের মাধ্যমে পুরো জাতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।
তাই ব্যভিচার রোধে ইসলামের বিধান খুবই সুস্পষ্ট এবং কঠোর। যেমন আল্লাহ পাক বলেছেন:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

বাংলা অনুবাদ:

আর ব্যভিচারের কাছেও যেও না। নিশ্চয়ই এটি অশ্লীল কাজ এবং অত্যন্ত মন্দ পথ।

(সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত: ৩২)

অবিবাহিত ব্যভিচারিকে ১০০ বেত্রাঘাত করার হুকুম রয়েছে। কুরআন পাকে এসেছে -

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

বাংলা অনুবাদ:

ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ — উভয়ের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করো।

আর আল্লাহর দীন (বিধান) বাস্তবায়নে তাদের প্রতি কোনো দয়া তোমাদের যেন প্রভাবিত না করে,

যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকাল দিবসে বিশ্বাসী হও।

এবং তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করুক মুমিনদের একটি দল।

(সূরা আন-নূর, আয়াত: ২)

রাসুল (সাঃ) বলেছেন বিবাহিত ব্যভিচারিকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করার কথা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

«خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، الثَّيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ، ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ، وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ، ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ»

তোমরা আমার নিকট থেকে জেনে নাও যে, আল্লাহ তাআলা ব্যভিচারীদের ব্যাপারে পন্থা বাতলে দিয়েছেন। বিবাহিত পুরুষ বিবাহিত নারীর সঙ্গে ব্যভিচার করলে এবং অবিবাহিত পুরুষ অবিবাহিতা নারীর সঙ্গে ব্যভিচার করলে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। (সুতরাং শাস্তি হল যে,) বিবাহিতকে একশ' বেত্রাঘাত করা হবে অতঃপর প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হবে। আর অবিবাহিতকে একশ' বেত্রাঘাত করা হবে অতঃপর এক বছরের জন্য দেশান্তর করা হবে। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৬৯০]

ইসলামে ধর্ষণের শাস্তিও এই। যদি ধর্ষক বিবাহিত হয় তবে তাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যার বিধান। সমাজ থেকে যিনা, ব্যভিচার ও ধর্ষণ রোধের একমাত্র উপায় হলো ইসলামি শাসন স্থাপন করা ও সেকুলারিজম - ফেমিনিজম থেকে দূরে থাকা।

কুমারী মা ও গর্ভপাত বৃদ্ধি :

মানুষের জীবনের প্রতিটি ধাপই গুরুত্বপূর্ণ। শৈশব, কৈশোর, যৌবন, পৌঢ়ত্ব বা বার্ধক্য- জীবনের কোনো পর্যায়ই মূলত এমন নয় যে, সে সময়ে জীবনকে পরিশীলিত ও সুন্দর রাখার প্রয়োজন নেই; যে কোনো রকম খেয়াল খুশি ও প্রবৃত্তিজাত স্রাতের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া যায়। তবে এসবের মধ্যেও কৈশোরে-যৌবনে জীবনের শক্তি, গতি ও প্রাচুর্য থাকে সবচেয়ে বেশি। এর সঙ্গে থাকে জীবন ও জগতের অনুদ্ঘাটিত, এমনকি অপরিমিত আকাঙ্ক্ষার বিচিত্র হাতছানি। প্রাচীন যুগে সব বয়সী মানুষ ও যৌবনের মানুষকে বিপথগামী করতে নানা রকম খাহেশাতের শিল্প তো উপস্থাপন করা হতো, কিন্তু সেসব বিচ্যুত শিল্পের সঙ্গে এতরকম মোহনীয় যুক্তি ও গ্রহণযোগ্যতার শ্লোগান যুক্ত করা হতো না। আধুনিক সময়কালে এ-এক নতুন তামাশা ও ট্রাজেডি; প্রবৃত্তি-অশ্লীলতা ও খাহেশাতের সঙ্গে বিচিত্র যুক্তি, তর্ক, ধমক, মর্যাদার ও অধিকারের ইস্যু যুক্ত করে দেওয়া হয়। মানুষ-সভ্যতার সবচেয়ে সম্ভাবনা ও গতির আধার যুবক শ্রেণির মধ্যে বয়সী মনের চপলতাকে উসকে দেওয়ার জন্য এসবের পেছনে লাগিয়ে দেওয়া হয় বুদ্ধিবৃত্তি ও ক্ষমতার প্রভাবকেও। এভাবেই জাগতিক নানামাত্রিক উন্নতি ও সুখের আপ্তবাক্যের পাশাপাশি খুলে দেওয়া হয় প্রবৃত্তির অবারিত বাজারের দরজা।

নারীবাদ নারীকে শিখিয়েছে ব্যক্তিস্বাধীনতা। যার দেহ সে যা খুশি তাই করতে পারবে। হোক সেটা ব্যভিচার, হোক যিনা কিংবা নিজের শরীরের কৃত্রিম পরিবর্তন।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন-

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَـٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

বাংলা অনুবাদ:

আর তারা (আল্লাহর বান্দাগণ) সেইসব লোক নয় যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো উপাস্যকে আহ্বান করে, এবং যে প্রাণকে আল্লাহ হত্যা হারাম করেছেন তাকে যথোচিত কারণ ছাড়া হত্যা করে, এবং ব্যভিচার করে। আর যে এগুলোর কোনো একটি করে, সে শাস্তির সম্মুখীন হবে।

সূরা ফুরকান-৬৮

ইসলাম শুধু নারী নয় পুরুষকেও ব্যভিচার থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। ব্যভিচারের জন্য রয়েছে শাস্তি উভয় নারী এবং পুরুষের জন্য। যেমন কুরআন এ এসেছে -

وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا

তোমাদের মধ্য থেকে যে দু'জন সেই কুকর্মে লিপ্ত হয়, তাদেরকে শাস্তি প্রদান কর। [সূরা নিসা-১৬]

নারীরা এখন এতটাই আত্নকেন্দ্রীক ও মুখজোর হয়ে গেছে যে তাদের কাছে গর্ভপাত কোনো ব্যাপারই না।

কুমারী মা হওয়া বরং তাদের কাছে গর্বের বিষয়।

অনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পরে ভুলে যদি সন্তান গর্ভে চলে আসে তবে সেটার সমাধান গর্ভপাত। এমনকি বেশির ভাগ দেশেই নারী যদি চায় তো গর্ভপাত করা বৈধ। মুলত নারীবাদীরাই গর্ভপাত বৈধ করার জন্য আন্দোলন করেছে যাতে তাদের এসব যৌনাচারের জন্য ভুগতে না হয়।

আবার অনেকে ইচ্ছা করেই বিবাহ ছাড়া গর্ভধারণ করে যাতে ধনকুবেরদের থেকে সন্তানের উছিলায় ইচ্ছামত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে পারে।

বৈশ্বিক ও বাংলাদেশের প্রেক্ষিতেও বর্তমানে এসবের হার খুব বেড়ে গেছে।

পুরো বিশ্বে প্রতিবছর **প্রায় ৭কোটি ৩০ লক্ষ** গর্ভপাত ঘটে। এর মধ্যে ৪৫% গর্ভপাত অবৈধ। আবার বাংলাদেশে এখনো গর্ভপাত বৈধ না হলেও **MR (১০-১২ সপ্তাহ) সীমিত বৈধ।** প্রতিবছর ১০-১১ লক্ষ MR গর্ভপাত হয়ে থাকে বাংলাদেশ এ। যার মধ্যে ৭-৮ লক্ষ ক্লিনিকে এবং বাকি গুলো কোনো মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট ছাড়াই বিপদজনক অবস্থায় হয়ে থাকে।

এসব গর্ভপাতকারীর মধ্যে ১২-১৫% কমবয়সী কিশোরী যাদের বয়স ১৫-১৯ বছর। যাদের ৪০% এই অনিরাপদ গর্ভপাত করে।

এবার আসা যাক কুমারী মায়ের হিসাবে। যদিও বাংলাদেশ সরকারের কাছে এই পরিসংখ্যান খুব অল্প পরিমাণই আসে কিন্তু এনজিও গুলোর পরিসংখ্যান এ সংখ্যা টা কিছুটা বেশি (সঠিক সংখ্যা অজানা)।

বিশ্বে প্রতিবছর ১কোটি ২০ লক্ষ কিশোরী বিবাহ ছাড়াই সন্তান জন্ম দেয়। যাদের বয়স ১৫-১৯ এর মধ্যেই। বাংলাদেশের শহুরে অঞ্চলে ১০০ জন কিশোরী মায়ের মাঝে ৫-৭ জন বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক থেকে গর্ভবতী হয়।

আচ্ছা যদি অল্প বয়সে বিয়ে ও মা হওয়া নারীর জন্য ক্ষতিকর হয়ে থাকে তাহলে এতগুলো সংখ্যক কিশোরী মা ও গর্ভপাত কি তাদের কোনো ক্ষতি করে না??!! নাকি শুধু সামাজিক আর ধর্মীয় মুল্যবোধ থেকে একজন মেয়েকে জলদি বিয়ে দিলেই স্বাস্থ্য ও জীবনের ঝুকি রয়েছে?

এগুলো আসলে নারীবাদের আইওয়াশ। তারা এসব ভ্রান্ত ধারণার এতটাই প্রচার করেছে যে মানুষ সেটাই সত্য মনে করছে। উপরে উপরে এসব বুলি আওড়ায় তারা সমাজের সব শ্রেণির মানুষদের অস্থিতিশীল করে নিজের ফায়দা লুটছে। মানুষকে ধর্ম থেকে দূরে রাখা, সমাজের শৃঙ্খলা নষ্ট করা, ইসলামী চিন্তা চেতনার মানুষকে অপদস্ত করাই তাদের কাজ।

ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামী ইস্যু:

বর্তমান যুগে সমকামীতা ও ট্রান্সজেন্ডারবাদ নামে খুবই ভয়ঙ্কর এক ফিতনার প্রকাশ ঘটেছে, যাকে বলা যায় 'সকল নোংরামি ও অশ্লীলতার সর্বোচ্চ পর্যায়'। আফসোস, পাশ্চাত্য থেকে ছড়াতে ছড়াতে এখন তা মুসলিম দেশগুলোতেও অনুপ্রবেশ করতে শুরু করেছে।

আগেই বলা হয়েছে ফেমিনিজম এর তৃতীয় ওয়েভ এনেছিলো সমকামী, ট্রান্সজেন্ডার ও যৌন স্বাধীনতার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য।

আগে সমকামী ও সমকামীতা কি সেটা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

Jewish Virtual Encyclopedia তে বলা হয়েছে *তালমুদে* উল্লেখিত আসলে ৮ ধরনের লিঙ্গ আছে। তালমুদে বর্ণিত ইহুদি ধর্মের আটটি লিঙ্গ হলজাচার (পুরুষ), নেকেভা (মহিলা), অ্যান্ড্রোজিনোস (পুরুষ এবং মহিলা উভয় বৈশিষ্ট্যই), টুমটুম (যৌন বৈশিষ্ট্যের অভাব), আয়লোনিত হামাহ (নির্ধারিত মহিলা, স্বাভাবিকভাবেই পুরুষ বৈশিষ্ট্য বিকাশ করে), আয়লোনিত আদম (নির্ধারিত মহিলা, হস্তক্ষেপের মাধ্যমে পুরুষ বৈশিষ্ট্য বিকাশ করে), সারিস হামাহ (নির্ধারিত পুরুষ, প্রাকৃতিকভাবে মহিলা বৈশিষ্ট্য বিকাশ করে), এবং সারিস আদম (নির্ধারিত পুরুষ, হস্তক্ষেপের মাধ্যমে মহিলা বৈশিষ্ট্য বিকাশ করে)। এই বিভাগগুলি আইনি ঐতিহ্যে ব্যবহৃত হত, এবং আজ পণ্ডিতরা ইহুদি ধর্মের মধ্যে নন-বাইনারি এবং ট্রান্সজেন্ডারদের জন্য একটি রোডম্যাপ প্রদানের জন্য এগুলি পুনরায় পরীক্ষা করে দেখেন। এর অর্থ হলো একজন পুরুষ নারী হতে পারে, একজন নারী পুরুষ হতে পারে, কেউ কোনোটাই নাও হতে পারে আবার সবাই উভয়টিও হতে পারে।

আবার এটাও প্রকাশ করেছে যে এই ৮ লিঙ্গের ধারণা এবং সমকামীতা মুসলিম, খ্রিস্টান কিংবা অন্য কোনো ধর্মের ধারণা নয়। এটা একান্তই ইহুদিদের। তাহলে এখন আমরা ধারণা করতে পারি কেনো নারীবাদীরা মুলত সমকামী মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চায়!।

মানুষ নিজের কুপ্রবৃত্তির কারণে যত সীমা অতিক্রম করেছে তার মাঝে সমকামীতা সবচাইতে বড় অবক্ষয়। কওমে লুতের ফেতনা হলো সবচেয়ে জঘন্য ফেতনা। নারীবাদীরা দাবী করে যার দেহ সে যা খুশি করতে পারে। সমকামী হলো যারা মুলত সম লিঙ্গের প্রতি যৌন আকর্ষণ অনুভব করে। মানে নারী নারীর প্রতি এবং পুরুষ পুরুষের প্রতি যৌন আকর্ষণ অনুভব করে। তো নারীবাদীরা দাবী করে তারা যদি চায় তবে অন্য নারীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে। এতে কারো বাধা দেওয়ার অধিকার নেই।

ইসলামে, সমকামীতা একটি গুরুতর পাপ ও নৈতিক অবক্ষয় হিসেবে বিবেচিত।

কুরআনে "কওমে লূত"-এর ঘটনা এর স্পষ্ট প্রমাণ:

"তোমরা কি নারীদের ছেড়ে পুরুষদের কাছে যৌন তৃপ্তি খুঁজো? বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।"

(সূরা আশ-শু'আরাঃ ১৬৫-১৬৬)

সমকামিতা মানুষকে পাপের দিকে টানে। সৃষ্টিকর্তা বিমুখ করে দেয়। এই পাপ এতটাই ভয়াবহ যে কওমে লুতকে আল্লাহ পাক একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। শুধু সমকামীরাই ধ্বংস হয়নি। লুত (আঃ) এর স্ত্রী কিন্তু সমকামী ছিলেন না। তবে সে সমকামীদের সাপোর্ট করতেন। আর সেজন্য সেও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল। আজও এর উদাহরণ আমরা দেখতে পাই মৃত সাগর বা ডেড সী কে দেখে। এখানেই কওমে লুতের বসবাস ছিলো। আল্লাহ শুধু তাদের ধ্বংসই করেননি বরঞ্চ সমগ্র পৃথিবীর জন্য নিদর্শন দিয়ে দিয়েছেন যে কত নিকৃষ্ট অপরাধ এটা যে কোনো জীব আজ অবদি মৃত সাগরে বাচঁতে পারেনা।

নবী লূত (আঃ)-কে আল্লাহ তাআলা পাঠিয়েছিলেন এক সমাজে, যারা পৃথিবীতে প্রথমবারের মতো সমকামিতাকে স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করেছিল। তারা পুরুষে-পুরুষে অশ্লীল কাজ করত এবং এতে গর্ব অনুভব করত।

কুরআনে আল্লাহ বলেনঃ

“তোমরা কি জগতের মধ্যে প্রথম সেই জাতি, যারা এমন অশ্লীল কাজ করছ যা তোমাদের আগে কেউ করেনি?”

(সূরা আল-আ‘রাফ ৭:৮০)

নবী লূত (আঃ) তাদের সতর্ক করে বলেছিলেন,

“হে আমার জাতি! তোমরা এই অশ্লীলতা ত্যাগ করো। আল্লাহ তোমাদের জন্য নারীদের সৃষ্টি করেছেন, তারা তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র।”

কিন্তু তারা উপহাস করে বলেছিল, “তুমি যদি এ কাজ থেকে আমাদের বিরত রাখতে চাও, তবে আমরা তোমাকে দেশ থেকে বের করে দেব।”

(সূরা আশ-শু‘আরাঃ ১৬৭)

অবশেষে আল্লাহর ধৈর্যের সীমা শেষ হয়। ফেরেশতারা তরুণদের রূপে এসে লূত (আঃ)-এর বাড়িতে অবস্থান নেন। সেই জাতি যখন অশ্লীল উদ্দেশ্যে সেখানে হাজির হয়, তখন ফেরেশতারা ঘোষণা করেন-

“হে লূত, নিশ্চিন্ত থাকো! আমরা তোমাকে ও তোমার পরিবারকে রক্ষা করব, তবে তোমার স্ত্রী ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।”

(সূরা হূদ ১১:৮১)

এরপর আল্লাহ তাদের নগর উল্টে দেন এবং পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

“আর আমরা তাদের উপর পাথর বর্ষণ করেছি, যা ছিল চিহ্নিত পাথর, সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য।”

(সূরা হূদ ১১:৮২–৮৩)

বাংলাদেশের আইনে এখনো এটা বৈধ নয় তবে ফেমিনিস্ট এবং বামপন্থীরা প্রচন্ড চেষ্টা চালাচ্ছে সমকামিতাকে বৈধ করার জন্য। বিশেষত ৫ই আগস্ট ২০২৪ এর পর থেকে।

বাংলাদেশের দণ্ডবিধির ধারা ৩৭৭ (Section 377 of the Penal Code, 1860) অনুযায়ী, "যে কোনো ব্যক্তি প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে, সে অপরাধী গণ্য হবে।"

এই ধারা অনুযায়ী, সমলিঙ্গের (পুরুষ-পুরুষ বা নারী-নারী) যৌন সম্পর্ক "অস্বাভাবিক অপরাধ" (unnatural offence) হিসেবে গণ্য করা হয়।

শাস্তি:

সর্বোচ্চ আজীবন কারাদণ্ড,অথবা দশ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং জরিমানা হতে পারে।

বাস্তবে এই আইনটি সচরাচর প্রয়োগ হয় না,

তবে আইনটি এখনো বিদ্যমান এবং সমকামী সম্পর্ক বাংলাদেশে আইনত অপরাধ।

সুতরাং বাংলাদেশে এখনো সমলিঙ্গ বিবাহ, নাগরিক অংশীদারিত্ব বা LGBTQ+ অধিকার স্বীকৃত নয়।

কিন্তু অন্তর্বতীকালীন সরকারের কিছু উপদেষ্টা রয়েছে যারা নিজেদের সামাজিক কর্মী বলে দাবী করলেও কট্টর নারীবাদী এবং LGBTQ activist। তারা প্রচন্ড চেষ্টা চালাচ্ছে যাতে নারীদের গর্ভপাত, সমকামীতার বৈধতা, সমলিঙ্গ বিয়ে, ট্রান্সজেন্ডার এসবের আইন পাশের জন্য। তারা বিভিন্ন সেমিনার করছে এসব নিয়ে, দাবী তুলছে প্রধান উপদেষ্টার কাছে, কোর্ট এ আর্জি দিচ্ছে।

এদের অন্যতম ইস্যু হলো ট্রান্সজেন্ডার।

ট্রান্সজেন্ডার" একটি পরিভাষা, যার দ্বারা এমন লোকদের বোঝানো হয়, যাদের লিঙ্গ পরিচয় তাদের জন্মগতভাবে নির্ধারিত লিঙ্গ পরিচয় থেকে ভিন্ন। তাদের লিঙ্গ পরিচয় জন্মগত চিহ্ন নয়; বরং তারা পুরুষ, না নারী— এ ব্যাপারে তাদের মানসিক বোধই তাদের লিঙ্গ পরিচয়। এই শ্রেনির মানুষের সেই মানসিক বোধ জন্মের সময় যে লিঙ্গ পরিচয় নির্ধারিত হয়েছিল তা থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। ... কোন কোন ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি হরমোন থেরাপি গ্রহণ করে থাকে আবার তাদের কেউ সার্জারিও করে। তবে সব ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি এগুলো করে না বা করতে পারে না। এবং এটি জেনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, ট্রান্সজেন্ডার হওয়া কোন চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণের উপর নির্ভরশীল নয়।

এই হচ্ছে ট্রান্সজেন্ডারের পরিচয় ও স্বরূপ। এই পরিচয় পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর এ বিকৃত ও বিকারগ্রস্ত মত বাদের খণ্ডনে আসলে কিছু বলারই প্রয়োজন পড়ে না। বিষয়টি একটু সহজভাবেই ভেবে দেখুন— আপনার পিতা, যাকে আপনি জন্মের পর থেকেই পিতা ডেকে আসছেন, একদিন সে নিজেকে নারী দাবি করে বসল! অথবা আপনার মা, যার কোলে আপনার বেড়ে ওঠা, জন্মের পর থেকেই আপনি যাকে মা ডেকে আসছেন, একদিন সে নিজেকে পুরুষ দাবি করে বসল! তখন বিষয়টি কেমন হবে?! আপনার সেই পিতামাতার মধ্যকার সম্পর্কটা এখন কী দাঁড়াল! আপনার পিতৃ-মাতৃ পরিচয়েরই বা তখন কী দশা হবে! আপনি যাকে পিতা বলছেন, সে কিনা একজন নারী কিংবা যাকে মা বলছেন, সে কিনা একজন পুরুষ! আজব!

তদ্রূপ কারো স্ত্রী, যার সাথে বিয়ের পর থেকে একত্রে থেকে আসছে, তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক হচ্ছে, তার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে সে অবগত, কিন্তু হঠাৎ সে একদিন নিজেকে পুরুষ দাবি করে বসল! তখন অবস্থা কী দাঁড়াবে?! অথচ ট্রান্সজেন্ডারবাদের পরিচয় এটিই যে, মানুষের লিঙ্গ পরিচয় তার মানসিক ব্যাপার। সে নিজেকে যে লিঙ্গের মনে করবে, সেটিই তার লিঙ্গ পরিচয়। ট্রান্সজেন্ডারবাদের এ পরিচয় জানার পর একথা আর বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এটা চরম শয়তানী মতবাদ। আর আল্লাহ আমাদের শয়তানের ধোকা থেকে বেঁচে থাকার আদেশ দিয়েছেন। যেমন সূরা বাকারাহ'য় এসেছে -

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

অর্থ:

“হে মানুষ! তোমরা পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র জিনিসগুলো খাও, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।”

সূরা আল-বাকারা ২:১৬৮

হিজড়ারা ট্রান্সজেন্ডার নয়- দেশের প্রধান মিডিয়াগুলোসহ বিশ্বমিডিয়া হিজড়দের ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে প্রচার করা হয়। এমন কি এমন শিরোনামও করা হচ্ছে ‘বাংলাদেশে প্রথম ট্রান্সজেন্ডার মুসলিম মাদ্রাসা’, বাংলাদেশের প্রথম রূপান্তরকামী সংবাদপাঠিকা’- মিসলিডিং বা ভুল পথে পরিচালিত করতে পারে। হিজড়া একটি জন্মগত জেনেটিক সমস্যা বা ডিসঅর্ডার। সম্প্রতি ভারতের হিজড়া গোষ্ঠীর প্রেসিডেন্ট নিজেদের ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে সংগায়িত করার জন্য প্রতিবাদ জানিয়েছে (The terms ‘Transgender’ and Hijra are not the same’ says Joya Sikder)। আমেরিকার বিখ্যাত গণমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্টও এই বিষয়টা আলোকপাত করেছে যে হিজাড়া এবং ট্রান্সজেন্ডার এক নয় (Why terms like ‘transgender’ don't work for India's ‘third-gender’ communities)। অন্যদিকে এলজিবিটি বা ট্রান্সজেন্ডারকে কোন অসুস্থতা, ডিসওয়ার্ডার বা কোনো মানসিক সমস্যা হিসেবে গণ্য করা হয় না। ট্রান্সজেন্ডার এর বাংলা অভিধানিক শব্দ হিজড়া লেখা হচ্ছে, আবার রূপান্তরকামীও বলা হচ্ছে যা মিসলিডিং।

হিজড়া হলো জন্মগত সমস্যা নিয়ে জন্মায়। তাদের সমস্যা ল্যাব টেস্টের মাধ্যমে নিশ্চিত করা যায়। এটি একটি বিরল ঘটনা। প্রতি ৫০০০ শিশুতে একজন হিজড়া হতে পারে। তারা অস্পষ্ট বাহ্যিক প্রজনন অঙ্গ নিয়ে জন্মাতে পারে অনেক ক্ষেত্রে ২০-২৫ বছর বয়সেও শারীরিক পরিবর্তন ঘটতে পারে। প্রকৃত মেয়ে হিসেবে বড় হতে থাকা কেউ পুরুষ হতে পারে যদি বয়ঃসন্ধি পার করেও ঋতুস্রাব না দেখা দেয়। সার্জারী দ্বারা পরিপূর্ণ নারী বা পুরুষ হয়ে সন্তান জন্ম দিতে পারে না।

অপরদিকে ট্রান্সজেন্ডার হলো আত্মঅনুভূত মানসিক অবস্থা যা জন্মগত লিঙ্গের সাথে সম্পর্কিত না। নারী হলে ভাবে নারীর দেহে আটকে থাকা পুরুষ আর পুরুষ হলে ভাবে পুরুষের দেহে আটকে থাকা নারী। ল্যাব টেস্টেও বুঝা যায় যেহেতু স্বঘোষিত ব্যাপার। সার্জারীর মাধ্যমে

কখনো সম্পুর্ণ লিঙ্গ পরিবর্তন হয় না। যে পুরুষ রা সার্জারী করে নারী হয় তাদের প্যানিস থাকে আবার যে নারী পুরুষ হয় তাদের যোনী থাকে। মুলত কারোরই কার্যকরী প্যানিস বা জরায়ু থাকেনা। ট্রান্সজেন্ডার সার্জারীর উপর নির্ভর করে না সব সময়। নির্ভর করে তাদের দেওয়া পরিচয় এর উপর। তারা ঠিক করে দেয় তাদের কি বলে ডাকতে হবে। He, she or they এসব তারাই জানান দেয়। অন্য লিঙ্গের মত পোশাক পরিধান ও মেকআপ করেও নিজেকে উপস্থাপন করে। ট্রান্সজেন্ডাররা মুলত সমকামী আবার অনেক সময় বাইসেক্সুয়াল ও হতে পারে।

স্বাভাবিক একটা মানুষ অপর লিঙ্গের আরেকজনকে বিয়ে করে নিজের বংশ বিস্তার করে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। আল্লাহ আমাদের জন্য এটা হালাল করেছেন। কিন্তু সমকামীতা এবং ট্রান্সজেন্ডার এজেন্ডা হলো প্রকৃতি ও ধর্ম বিরোধী। এটা একটি জঘন্য পাপ। সামাজিকভাবে এটা অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে।

এক যুগ কম সময়ের মধ্যেই শিশু-কিশোরদের মাঝে ট্রান্সজেন্ডার আইডেন্টিটি নেওয়ার হার ব্যাপকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। আমেরিকায় ২০১০ তুলনায় জেন্ডার ডিস্ফোরিয়া (যারা নিজেদের ভুল দেহে আটকা পড়েছে বলে মনে করে) ইস্যুতে (এটা মানসিক সমস্যা মনে করা হয় না) ক্লিনিকে চিকিৎসা নিতে আসা শিশু-কিশোরদের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৫০০০, ইংল্যান্ডের ছেলেদের মধ্যে বেড়েছে ১৪৬০, আর মেয়েদের ক্ষেত্রে তা হয়েছে ৫৩৩৭%। সুইডেনে বেড়েছে ১৪০০% এবং ডেনমার্কে বেড়েছে ৬৭,০০০%। ২০২২ সালের সমীক্ষা অনুসারে আমেরিকার তরুণ প্রজন্মের (যাদের জন্ম ১৯৯৭-২০০২ সালে, এদের Z Generation বলা হয়) প্রায় ২১% এলজিবিটি আইডেন্টিটি গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে যাদের জন্ম ১৯৬৫ সালের আগের হয়েছিল তাদের মধ্যে এটা ছিল মাত্র ২%। আমেরিকার এবং ব্রিটেনের তরুণ প্রজন্মের প্রায় ৪০% নিজেদের জন্মগত লিঙ্গ পরিচয় নিয়ে সন্দিহান বা বিশ্বাসী নন, অর্থাৎ নন-বাইনারি (এখনো জেন্ডার পরিচয়ে ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে)। অন্যভাবে বলা যায় তারা এলজিবিটি এই মতাদর্শে বিশ্বাসী।

পারিবারিক শৃঙ্খলা ও ভাতৃত্ব ধ্বংস হয়। সম্পদের উত্তরাধিকারী নির্ভর করে নারী ও পুরুষ পরিচয়ে। এখন যারা আজীবন তাদের বোনকে মেয়ে মেনে আসছে তারা কি করে পুরুষ মনে করা বোনের জন্য সম্পদ বন্টন করবে। আবার উল্টো ঘটনাও ঘটতে পারে। আসলে এরা সুবিধা বাদী। যখন যেখানে যে পরিচয় দিয়ে লাভ হবে তখন সেই পরিচয় দিয়ে নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ট্রান্সজেন্ডার নারী (অর্থাৎ জন্মগত পুরুষ) কোন হলে সিট পাবে? ক্যাডেট কলেজ এবং আর্মি ব্যারাকে কেউ ট্রান্সজেন্ডার ঘোষণা দিলে তার স্থান কোথায়ও হবে? তারা কোন কোন টয়লেট ব্যবহার? দিন দিন এই সমস্যাগুলো পশ্চিমা সমাজে প্রকট হয়ে উঠছে। ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে মেয়েদের টয়লেট-লকার রুম ব্যবহার করার প্রাইভেসি নিয়ে পশ্চিমা দেশগুলোতে বিবৃত অবস্থায় পড়েছে প্রকৃত মেয়েরা। ব্রিটেনের মিনিস্ট্রি অব জাস্টিস

ডিপার্টমেন্টের তথ্য অনুযায়ী- জেলখানায় ১৭৬ জন ট্রান্সজেন্ডার নারীর (জন্মগত পুরুষ) ৭৬ জন যৌন নির্যাতনমূলক অপরাধে জড়িত হয়। এদের ৩৬ জন ধর্ষণ (rape is defined as penetration with penis) এবং ১০ জন ধর্ষণের প্রচেষ্টার জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়। এখানে যে বিষয়টা জানা গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে ৯৭% (ব্রিটেন এবং আমেরিকার ডাটা) এর বেশি ট্রান্সজেন্ডার নারীতে পুরুষাঙ্গ থাকে।

বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। অলিম্পিয়াড, নারী ক্রিকেট, ফুটবল এমনকি সেরা সুন্দরী প্রতিযোগিতাতেও ট্রান্স নারীরা অর্থাৎ পুরুষরা অংশগ্রহণ করছে।

সমকামী বা ট্রান্সদের তো পরিবার বৃদ্ধি করার কোনো রাস্তা নেই। নারীবাদীরা ইহুদিদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে তো এটাই চায় যে দুনিয়াতে বিশৃঙ্খলা ও ফেতনা সৃষ্টি করে সবাইকে এসবে ব্যস্ত রেখে দাজ্জলি সাম্রাজ্য কায়েম করা।

বাংলাদেশের ট্রান্সজেন্ডার অধিকার আইন করা হবে আত্মঘাতী :

জন্মগত লিঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তিতে আমাদের জন্ম সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) ও পাসপোর্ট দেয়া হয়। এগুলো উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টন, ব্যাংকের নমিনি, মালিকানা ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত। পশ্চিমা দেশগুলোতে এসব ডকুমেন্টে লিঙ্গ পরিচয় নাকি জেন্ডার আইডেন্টিটি থাকবে তা নিয়ে ব্যাপক রাজনৈতিক, সামাজিক এবং একাডেমিক বিতর্ক হচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশে গভীর চিন্তা-ভাবনা এবং বিশ্লেষণ ছাড়াই ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রভাবিত হয়ে এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ভোক্তভোগী হতে পারে। প্রসংগত, দেশের পাসপোর্টে লিঙ্গ পরিচয় উঠিয়ে জেন্ডার শব্দ যুক্ত করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সরকারি ডকুমেন্টে সেক্স শব্দ উঠিয়ে ইদানীং জেন্ডার শব্দ ব্যবহার করা শুরু হয়েছে।

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে 'সমকাল'-একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যা শংকিত করার মতো বিষয়। পত্রিকাটি জানায় - 'ঢাকাস্থ নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের রাজনৈতিকবিষয়ক প্রথম সচিব কর স্টৌটেন বলেন, বাংলাদেশ সরকার ট্রান্সজেন্ডার এবং তৃতীয় লিঙ্গ সম্প্রদায়ের মানুষকে জাতীয় পরিচয়পত্র ও পাসপোর্টে স্বীকৃতি দিয়েছে। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে বিশ্বের অধিকাংশ দেশ থেকে এগিয়ে আছে। এটা খুবই প্রশংসনীয়। নো পাসপোর্ট ভয়েস এর ট্রান্সজেন্ডার অধিকারবিষয়ক শুভেচ্ছা দূত হো চি মিন ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারত, পাকিস্তানসহ দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশ থেকে এগিয়ে আছে।' – এই খবরটি যদি সত্যি হয় তবে দেশে সুদূরপ্রসারী ভয়াবহ প্রেক্ষাপট তৈরি হবে। ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা খসড়া আইন পাস করা হলে ট্রান্সজেন্ডার আইডেন্টিটি স্বীকৃতি দেয়া হবে এবং এর মাধ্যমে প্রকান্তরে দেশে সমকামিতা আইনত বৈধ হতে বাধা থাকার কথা নয়।

বরও দুঃখের বিষয় হলো গত তথাকথিত নারী দিবসে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা সম্মেলন এ কোনো নারীকে নয় বরং একজন ট্রান্স নারী(হোচিমিন) কে সম্মানিত করেছিলো। তাহলে সত্যিকার নারীদের ভুমিকা কোথায় গেলো? ফেমিনিজম কি নারীদের অধিকার নিশ্চিত করে নাকি সমকামী ও ট্রান্স জেন্ডারদের?!

জন্মনিয়ন্ত্রণ ও নারী-স্বাধীনতা:

ইসলামে জন্মনিয়ন্ত্রণ বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে জায়েজ রয়েছে। যেমন: শারীরিক অসুস্থতা, ছোট বাচ্চা বা যেকোনো শরীয়তসম্মত কারণ। বিভিন্ন হাদিসে এসেছে নবী(সাঃ) বেঁচে থাকাকালীন অনেক সাহাবীই আজল করতেন কিন্তু নবী(সাঃ) এতে তাদের মানা করেন নি। তবে আর্থিক সমস্যা এবং চিরস্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ জায়েজ নেই। কেননা রিযিকের মালিক আল্লাহ তায়ালা। উনি যেমন বাবা মার জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন তেমন সন্তানের জন্যও করবেন। জন্মনিয়ন্ত্রণের জায়েজ পন্থা শুধু মাত্র হালাল সম্পর্কেই অবলম্বন করা যাবে। যেকোনো ধরনপর অবৈধ সম্পর্কে এসব করা জায়েজ নয়।

নারীবাদের দ্বিতীয় ওয়েভ এ গর্ভপাতের সাথে আরেকটা দাবী তোলে তারা যা হলো জন্মনিয়ন্ত্রণ। সাধারণ প্রেক্ষিতে স্বামী-স্ত্রী চাইলে এটা ব্যবহার করতেই পারে কিন্তু ফেমিনিস্টরা এটার জন্য স্লোগান দেয় My body, My choice। মানে নারীর দেহ সে চাইলে বাচ্চা হবে না চাইলে হবে না। এটা শুধু বৈবাহিক সম্পর্কে নয় যেকোনো যিনা ব্যভিচারেও জন্যও তারা ব্যবহার করে। জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সহজলভ্যতা সমাজে অনৈতিক সম্পর্ক বাড়িয়ে দিয়েছে। কেননা তাদের আর ভয় নেই অবাঞ্ছিত কোনো পরিণতির। ফেমিনিজম এর দ্বিতীয় ওয়েভের সময় আবিষ্কৃত হয় Birth control pil। তখন এটাকে তারা ব্যবহার করে মাতৃত্বের উপর নারীর নিয়ন্ত্রণ বক্তব্যে।

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার:

New World Order" (সংক্ষেপে NWO) অর্থ হলো —

"একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থা",

যেখানে পৃথিবীর সব দেশ, অর্থনীতি ও নীতি একটি কেন্দ্রীয় শক্তি বা সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

এই ধারণা প্রথম উঠে আসে ২০শ শতকে, বড় রাজনৈতিক পরিবর্তনের সময়:

- **১৯১৯**: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন "League of Nations" গঠনের কথা বলেছিলেন — তখনই "নতুন বিশ্বব্যবস্থা" শব্দটি ব্যবহার করেন।
- **১৯৪৫**: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘ (UN) প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেকে তখনও বলেছিলেন, এটি "নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার"-এর সূচনা হতে পারে।
- **১৯৯১**: আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ এইচ. ডব্লিউ. বুশ "Gulf War" চলাকালে বক্তৃতায় আবার বলেন — "We are witnessing a new world order."

সব মানুষকে একই ব্যবস্থায় আনয়ন করা:

বিশ্ব অর্থনীতি এক ব্যাংক ব্যবস্থার অধীনে আনা।

ডিজিটাল কারেন্সি, ক্রিপ্টো বা সেন্ট্রাল ব্যাংক সিস্টেমের মাধ্যমে সবাইকে নিয়ন্ত্রণ।

ধর্মহীন সমাজ গঠন করা, যেখানে মানুষ "শক্তিশালী এলিট গোষ্ঠীর" অধীনে থাকবে:

ধর্মহীন বা একীভূত ধর্ম ব্যবস্থা তৈরি করা
যাতে ধর্মীয় বিভাজন না থাকে, এবং আধ্যাত্মিক বিশ্বাসও দুর্বল হয়।
জনসংখ্যা কমানো, প্রযুক্তি দিয়ে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করা, ক্রোমোজম নিয়ে গবেষণা করে সমকামীতা ও আন্তঃলিঙ্গের মতো বিষয় (যেমন মাইক্রোচিপ, AI ইত্যাদি):
নাগরিকদের পূর্ণ নজরদারি (Surveillance State)
ক্যামেরা, AI, মাইক্রোচিপ, ডিজিটাল আইডি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কমানো।
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক প্রকৌশল
খাদ্য, ওষুধ, যুদ্ধ বা জলবায়ু নীতি দিয়ে জনসংখ্যা কমানো বা নিয়ন্ত্রণ করা।
জনসংখ্যা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করতে চায়। এজন্যই তো এই উপমহাদেশে নারীদের ব্রেইনে এটা গেথে গেছে যে অধিক সন্তান স্বাস্থ্যের ক্ষতিকর। একটা বা দুটোর বেশি সন্তান কেউ চায়না। অথচ পশ্চিমারা নিজেরাই ১০-১২ জন সন্তানের জন্মদাতা। অনেক ক্ষেত্রে এমন হয় যে স্বামী সন্তান গ্রহণে রাজী থাকলেও স্ত্রী চায় না। সুতরাং সে জন্মনিরোধক ব্যবহার করে। কেননা মাতৃত্বে নারীর নিয়ন্ত্রণ। এই জন্মনিয়ন্ত্রণ এর ভূত কিন্তু এলিট শ্রেণীর মানুষের মাথায় বসে না। টার্গেটেড মানুষরাই এই ভূত মাথায় নিয়ে ঘুরে। যেখানে বেশি সংখ্যক সন্তানদান কারী মায়েদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে সেখানে নারীবাদীরা ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে সমাজকে। নবীজী (সাঃ) বলেছেন-
"তোমরা সেই নারীদের সঙ্গে বিবাহ করো, যারা সন্তান-প্রসবী ও সন্তানপ্রিয়; কেননা আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্যের দ্বারা অন্যান্য উম্মতের সামনে গর্ব করবো।"
(সুনান আবু দাউদ, হাদীস: ২০৫০)
জন্মনিয়ন্ত্রণ এর খপ্পরে পরে অনেক দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নেগেটিভ এ চলে এসেছে। তাই তো ইউরোপের দেশ গুলো যেমন - ফ্রান্স, জার্মানি, সুইডেন, হাঙ্গেরি,রাশিয়া, ফিনল্যান্ড এশিয়ার চীন, জাপান, সিঙ্গাপুর এমনকি কানাডাও জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য শিশুদের ও মায়েদের বিভিন্ন ভাতা প্রদান করে।
জন্মনিরোধক পিল হলো হরমোনাল ঔষধ। এসব সেবনের ফলে মাসিকে অনিয়ম, বমি-বমিভাব, মাথা ঘুরানো, উচ্চ রক্তচাপ, দীর্ঘদিন সেবনের ফলে হৃদরোগের সম্ভাবনাও থাকে। বৈধ ভাবেও এসব ব্যবহারের এত কুফল তাহলে অবৈধ ব্যবহারের কি অবস্থা হবে!? বর্তমান সমাজে যিনা করাকে খুবই স্বাভাবিক ভাবে নেওয়া হয়। বরঞ্চ যারা এসব থেকে দূরে থাকে তাদেরকেই ব্যাকডেটেড ধরা হয়। তো এই যে ছেলে মেয়ের অবাধ মেলামেশা, ডেটে যাওয়া, সর্বোচ্চ পর্যায়ে যিনা করা কোনোটাই অপরাধ হিসেবে ধরা হয় না। যেখানে ১৮ বছর বয়স হবার আগে কোনো মেয়েকে বিয়ে দেওয়া যায় না কারণ এতে নাকি শারীরিক ক্ষতি হয়। গর্ভধারণ এ মৃত্যু ঝুকি থাকে। আবার এই মেয়েরাই যখন অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে তখন নারীবাদীদের কাছে তা নারী স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে উঠে। বিবাহ ছাড়া নারী গর্ভবতী হলে কোনো ঝুকি থাকে না যেনো। জন্মনিরোধক এতটাই সহজ লভ্য যে স্কুল পড়ুয়া ছেলে

মেয়েদের এসব যোগাড় করা কোনো ব্যাপারই না। তাই তো আবাসিক হোটেল, পার্ক, ফাঁকা বাসায় খুব সহজেই ছেলেমেয়েরা কাজে লাগিয়ে ফেলে। পরিণতি- সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, STD, HIV ধরনের রোগ, অশ্লীলতা।

সমাজের শৃঙ্খলা ও শ্লীলতা বজায় রাখার জন্য অবশ্যই ইসলামি আইনের প্রয়োগ দরকার। কেননা ইসলাম যা যা নিষিদ্ধ করেছে সবটাই সমাজের, রাষ্ট্রের, ব্যক্তির ইহকাল ও পরকালের জন্য ক্ষতিকর।

ফেমিনিজম বাল্যবিবাহ বন্ধ করে কিন্তু অশ্লীলতাকে স্বাধীনতা বলে:

আল্লাহপ্রদত্ত বিবাহ নীতিকে কেন্দ্র করেই এ ধরাধামে মানবীয় জীবনপ্রণালী সূচিত হয়। কালে কালে মানবীয় প্রথা-আদর্শে নানা আঙ্গিকে উত্থান পতন ঘটলেও বিবাহ ধারণাটি এখনো অক্ষুণ্ণ রয়েছে বেশ শক্তিমত্তার সাথেই। তাই পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মেই বিবাহ প্রক্রিয়াটিকে বেশ ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে চর্চা করা হয়।

ইসলামী আইনের কোথাও বিবাহ প্রথাটি বয়সসাপেক্ষ বিবেচনায় উপস্থাপিত হয়নি। সেখানে এর জন্য সময়-কালও বেধে দেয়া হয়নি। যে কোনো বয়সে বিবাহ চুক্তিটি হয়ে যেতে পারে। তবে দাম্পত্য জীবন সূচনার জন্য সাবালকত্বসহ আবশ্যিক সক্ষমতার বিধান সেখানে আরোপিত হয়েছে।

বাল্যবিবাহ অর্থ অপরিণত বয়সে বিয়ে। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৩ (খসড়া) ২ নং ধারার (গ) য়ে বলা হয়েছে 'বাল্যবিবাহ' অর্থ সেই বিবাহ যাহাতে সম্পর্ক স্থাপনকারী পক্ষদ্বয়ের যে কোনো একজন নাবালক।

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯ (১৯২৯ সালের ১৯ নং আইন) এর ২নং ধারার 'ঘ' অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'নাবালক' (Minor) বলতে পুরুষের ক্ষেত্রে একুশ বৎসরের কম এবং নারীর ক্ষেত্রে আঠার বৎসরের কম যে কোনো ব্যক্তিকে বুঝাবে।' একই কথা বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৩ (খসড়া) ২নং ধারার (খ) য়ে বলা হয়েছে।

তবে ইসলামী আইন অনুসারে, একজন বালক বা বালিকা যখনই প্রজনন ক্ষমতা অর্জন করে তখনই তার নাবালকত্বের মেয়াদ শেষ।(Child-Marriage-Prevention-Law-2013, মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন ৪১৪)।

জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদে ১৮ বছরের নিচে সবাইকে শিশু বলা হয়েছে।

বাংলাদেশের জাতীয় শিশু নীতিতে বলা হয়েছে ১৮ বছরের নিচে সকল বালক বালিকাই শিশু।

মেয়েদের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন বয়স ১৮ বিয়ের জন্য আর ছেলেদের ২১। এক্ষেত্রে মেয়ের বয়স ১৭ এবং ছেলের বয়স ২১ কিংবা মেয়ের বয়স ১৮ ও ছেলের বয়স ২০ হয় তবুও সাংবিধানিক আইনে তা বেআইনি হবে।

মানে একজনের জীবনে শৈশব, কৈশোর, যৌবন কিছুই নেই, সবটাই শৈশবকাল। অথচ ০-৫ বছর শৈশব কাল, ৬-১০ বাল্যকাল ও ১১-১৮ পর্যন্ত কৈশোরকাল হিসেবে বিবেচিত হয়।

আধুনিক এই বাল্যবিবাহের ধারণা এসেছে ইংরেজদের থেকে। ১৯২৯ সালে ব্রিটিশ সরকার Child marriage restrict act 1929 পাশ করে যাতে মেয়েদের সর্বনিম্ন বয়স ১৪ ও ছেলেদের ১৮ বছর করা হয়।

পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করে বয়স বাড়িয়ে ১৮ ও ২১ বছর করা হয়।

২০১৪ সালে ‘বাল্যবিবাহ নিরোধ’ শিরোনামে একটি খসড়া আইনে উদ্যোগ নেওয়া হয় মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ থেকে ১৬ তে আনার। কিন্তু তীব্র সমালোচনার মুখে সরকার একটা কৌশল অবলম্বন করে যে মেয়েদের বিয়ের বয়স সর্বনিম্ন ১৮ ই থাকবে কিন্তু বাবা-মা চাইলে ১৬ বছরেও বিয়ে দিতে পারেন।

শরীয়ত মোতাবেক বিয়ের জন্য বয়স নয়, সাবালকত্ব দেখা হয়। সাবালকত্বের সময়সীমা আন্তর্জাতিকভাবে ৮-১৬ বছরের মধ্যে উঠানামা করে।

কুরআনে এসেছে -

ۚ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

অর্থ-“আর তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা রজোনিবৃত্ত (মাসিক বন্ধ) হয়েছে, যদি তোমরা সন্দেহ কর (তাদের ইদ্দত সম্পর্কে), তবে তাদের ইদ্দত তিন মাস; এবং যাদের মাসিক হয়নি (অল্প বয়স বা অন্য কারণে) তাদেরও একইভাবে তিন মাস। আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতের মেয়াদ হলো—যতক্ষণ না তারা সন্তান প্রসব করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য তার কাজে সহজতা সৃষ্টি করেন।”

এতে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়, কুরআনিক আইনমতে বয়ঃসন্ধিকালের পূর্বেকার বিবাহ বিধিসম্মত। অথচ বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে নিছক প্রজনন ক্ষমতা অর্জনের পূর্বকালীন বিবাহই নয়; বরং প্রাপ্তবয়সে উপনীত হওয়ার চার পাঁচ বছরের পরবর্তী বিবাহকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

হযরত আয়েশা(রা:) থেকে বর্ণিত-

আমার যখন ছয় বছর বয়স হয় তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে নেন। আর আমার যখন নয় বছর বয়স হয় তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে বাসর যাপন করেন।

(সহীহ বুখারী; হা.নং ৫১৩৪, সহীহ মুসলিম; হা.নং ৩৫৪৫)

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তার কন্যা ফাতিমা (রাঃ) কে অল্প বয়সে হযরত আলী(রাঃ) এর সাথে বিবাহ দেন।

উমর (রাঃ) আলী রাযি. এর অল্পবয়সী মেয়ে উম্মে কুলসূম (রাঃ) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

যুবাইর ইবনুল আউয়াম (রাঃ)এর কন্যা যখন প্রাপ্তবয়সে উপনীত হন তখনই কুদামা ইবনে মাযউন (রাঃ) তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

ইবনে ইসহাক সুত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) উম্মে সালামা (রাঃ) এর অল্পবয়স্ক ছেলে সালামার সাথে হামযা (রাঃ) এর ছোট মেয়েকে বিয়ে পড়িয়ে দিয়েছিলেন।

এছাড়াও বহু সাহাবিরা নিজেরাও কম বয়সে বিয়ে করেছিলেন এবং তাদের সন্তানদেরও কম বয়সে বিয়ে করিয়ে দিয়েছিলেন।

ইসলামী শরীয়ার সূচনাকাল থেকে এখন পর্যন্ত উম্মাহর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, অল্পবয়সী শিশু-কিশোরদের বিবাহ বৈধ। এছাড়াও বহু বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ রয়েছে যারা অল্প বয়সে বিয়ে করেছিলেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীর বয়স ছিলো মাত্র ১০ বছর বিয়ের সময়। মিশরের রানী ক্লিওপেট্রা ১৭ বছরে বিয়ে করেন। স্কটল্যান্ডের রানী মেরির বয়স ছিলো ১৫ বছর বিয়ের সময়। আরও অসংখ্য উদাহরণ আছে।

বিবাহের ক্ষেত্রে আইনী সীমাবদ্ধতার কারণে আমাদের সমাজের চারিত্রিক অবক্ষয় ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। যিনা-ব্যাভিচার, অশ্লীলতা ও যৌনতার প্রাদুর্ভাব ঘটবে। যা রাষ্ট্রের জন্য চূড়ান্ত পরিণতি ডেকে আনবে। কারণ উঠতি বয়সের যুবক যুবতীরা বিবাহের অনুমতি না পেয়ে তাদের জৈবিক চাহিদা নিবারণ করার লক্ষ্যে অবাধ যৌনাচারের নিষিদ্ধ পথ মাড়াতে বাধ্য হবে।

স্কুল পড়ুয়া ছেলেমেয়েরা এখন অবাধ যৌনাচার লিপ্ত। বেশিরভাগ কিশোর কিশোরীরা অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করছে নিজের জৈবওক চাহিদা পুরণের জন্য। যদি বিয়ে তাদের জন্য সহজ হত বা যার প্রয়োজন তার বিয়েতে কোনো বাধা থাকত না তাহলে তো তাদের যিনার পথ গ্রহণ করতে হত না। বিয়ে ব্যাপার টাকে বর্তমানে এতই কঠিন করে দেওয়া হয়েছে যে আইনি ভাষায় প্রাপ্ত বয়স্ক হয়েও অধিকাংশ যুবক-যুবতী বিয়ে করতে পারেনা। যতদিন না তাদের নিজের সো কলড ফিউচার সেটেল্ড হচ্ছে। তাই তো তারা সহজলভ্য নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হচ্ছে।

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের কার্যকারিতাকে ফলপ্রসূ করার জন্যে জন্মনিবন্ধন আবশ্যক করে দেয়া হয়েছে। ফলে এ বিষয়টি গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের জন্য সীমাহীন মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ বিবাহের ক্ষেত্রে মানুষ হয়তো মিথ্যা সাক্ষ্য আনতে বাধ্য হচ্ছে নতুবা সন্তানের বয়সকে বিবাহযোগ্য করার জন্য অবিধানিক কোনো পন্থা গ্রহণ করছে। সমাজে এগুলো নিত্যনৈমত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাল্যবিবাহের কারণে সমাজে কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয়। এ সমস্যা নিরসনকল্পেই হয়তো বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। আইনের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা নিঃসন্দেহে যথাস্বীকৃত। কিন্তু বাল্যবিবাহের কারণে সামাজিক যে সমস্যা সৃষ্টি হয় তা নিতান্তই বিচ্ছিন্ন ঘটনা। বিচ্ছিন্ন দু- একটি সমস্যার সমাধানের জন্য পুরো বিবাহ ব্যবস্থাটিকে নিয়ন্ত্রণ করা কতটা যৌক্তিক তা বিবেচনার দাবি রাখে। কারণ সমাজে এমন অনেক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যার পরিপ্রেক্ষিতে অভিভাবকবৃন্দ তাদের সন্তানকে অল্পবয়সে বিবাহ দিয়ে পরিস্থিতি সামাল

দিতে বাধ্য হন। এ জন্য ইসলামী আইনে বাল্যবিবাহের ব্যাপারটিকে উন্মুক্তভাবে রেখে দেয়া হয়েছে।

যেমন : একজনের বালেগা ছেলে বা মেয়ে অবাধ যৌনাচার এ লিপ্ত হয়ে গেছে যার বয়স ১৮ হয়নি। সেই পিতা সন্তানকে পাপ থেকে বাঁচানোর জন্য বিয়ের ব্যবস্থা করবে কিন্তু দেশের আইন এতে বাধা দেয়।

গত কয়েক মাসে দেশে অস্বাভাবিক হারে এইচআইভি পজিটিভ রোগী বেড়েছে। কেনো? অবাধ যৌনতা, পরকিয়া, পতিতাবৃত্তি, সমকামীতা ইত্যাদি। তাহলে যদি এই বয়সীরা ঠিক সময়ে বিয়ে করত তবে কি আজ এই পরিণতি হতো??!!

ড. গুডুচ সি শুফলার ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন এর সামনে প্রদত্ত বক্তৃতায় বলেছিলেন, উঠতি বয়সের ছেলে মেয়েদের যৌন আবেগ-অনুভূতি মাত্রাতিরিক্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে।

ইটার্নি জেনারেল ক্লার্ক ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন এর উদ্ধৃতিতে বলেন, 'হত্যা, প্রতারণা এবং ব্যভিচার সংঘটনের ক্ষেত্রে সতের বছর বয়সী যুবক যুবতীরাই সবচাইতে বেশি জড়িত। বিশেষত শতকরা ত্রিশ পার্সেন্ট অবৈধ যৌন অপরাধের সাথে সতের বছর বয়সী যুবক যুবতীরা জড়িত। এটা তো শুধু ঐসব যুবক যুবতীদের কথা যারা অবৈধ যৌনাচারের অপরাধে গ্রেপ্তার হয়েছে।'

নিনা অ্যাপ্টন তার লাভ অ্যান্ড দ্য ইংলিশ গ্রন্থে জনৈক ইউরোপিয়ান স্কুল মাস্টারকে উদ্ধৃত করে রিপোর্ট করেন, 'আমার স্কুলের শিশুদের মাঝে পাঁচ বছর বয়স থেকেই কোর্টশিপ তথা প্রাকবৈবাহিক যৌনতার চর্চা শুরু হয়ে যায়। সেখানে আপনি অল্পবয়সী যুবক- যুবতীদের পরস্পরকে 'আহ্বান' করতে দেখতে পাবেন। বিশেষত যে সব শিশুদের কোনো বোন নেই তারাই সবচাইতে বেশি পরিমাণে 'যৌনক্রীড়া'য় লিপ্ত হচ্ছে।'অন্যত্র স্কুল শিক্ষক বলেন, 'এখানকার উঠতি বয়সী ছেলে-মেয়েদের মাঝে যৌন চর্চা এত বেশি পরিমাণে হয় যে, তার পরিসংখ্যান আমি তুলে ধরতে পারবো না। আর ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের সরকারী রিপোর্ট মতে প্রতি পঞ্চাশ জন মানুষের মধ্যে একজন মেয়ে শিশু অবশ্যই এমন রয়েছে যে সতের বছর বয়সের পূর্বে সন্তান প্রসবের আশা পোষণ করতে পারে।'

উপরোক্ত রিপোর্ট উদ্ধৃত করার পর নিনা অ্যাপ্টন লিখেন, 'এখানে এরকম অনেক ঘটনাও ঘটছে যে, এগার বার বছর বয়সেই মেয়েরা সন্তান প্রসব করেছে।'

এটা তো স্বতঃস্বীকৃত যে, এ আইন প্রণয়নের ব্যাপারটি প্রথমে কোনো মুসলিম আইনবিদের মাথায় আসেনি। অমুসলিম বিশেষত বৃটিশরা উনবিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম আওয়াজ তোলে। আর ফেমিনিস্টরা তো ওত পেতেই আছে সবসময়।

তারা মুলত কয়েকটি উদ্দেশ্যে বাল্যবিবাহ রোধের আইন করেছে। নবী (সাঃ) অল্প বয়সে বিয়ে করে নারীর প্রতি যুলুম করেছে এটা প্রমাণ করতে। (নাউজুবিল্লাহ)।

উঠতি বয়সের মুসলিম তরুণ- তরুণীরাও ইউরোপ আমেরিকানদের অনুসরণ করে প্রবৃত্তির চাহিদা মত মুক্তমনা পরিবেশে জৈবিক আনন্দ বিনোদন করে কাটাবে। পরিশেষে তাদের জীবনযাত্রাকে বিষাক্ত করে তুলবে।

মুসলিম তরুণীদের অল্পবয়সে বিবাহ হলে তারা মাতৃজীবনে অধিক সংখ্যক সন্তান জন্মদান করবে। এতে মুসলিমদের জনসংখ্যা অধিক হারে বেড়ে যাবে। সুতরাং একজন মুসলিম মা যেন তিনজনের অধিক সন্তান জন্মদান না করতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আর সে ব্যবস্থা হলো, ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কোনো মুসলিম তরুণী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। আর তাদের সন্তান ধারণের সর্বশেষ মেয়াদ হলো ৩৫ বছর। এরপর আর তারা গর্ভে সন্তান ধারণ করতে পারবে না। এবং দু'টি সন্তান গর্ভে আসার মাঝে পাঁচ বছর ব্যবধান থাকতে হবে। সারকথা মুসলিম তরুণীরা গড়ে তিনটির অধিক সন্তান গর্ভে ধারণ করতে পারবে না।

নারী বাদী ও পশ্চিমাদের দাবী যে ২০ বছরের আগে গর্ভধারণ করলে মা ও শিশুর মারাত্মক জীবন ঝুকি রয়েছে কিন্তু ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা তো ভিন্ন কথা বলছে। অনেক আগে থেকেই ১৪-১৫ বছরে মা হওয়ার রীতি চলে আসছে এমনকি অনেক নারী তো ১১-১২ বছর বয়সেও মা হয়েছেন। হ্যাঁ কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন কেউ কেউ। তবে ব্যতিক্রম তো কখনো উদাহরণ হতে পারেনা। বর্তমানে তো ২০-৩০ বয়সীদের ক্ষেত্রেও এমন হয়ে থাকে। পৃথিবীর বড় বড় জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক, লেখকদের ব্যাপারে যদি অনুসন্ধান চালানো হয় তাহলে দেখা যাবে অধিকাংশ মনীষীদের মায়েরাই সাক্ষর জ্ঞান ও পাঠ্য জ্ঞানে সমৃদ্ধ ছিল না। তবে এসব মহামনীষীদের প্রতিপালনের দায়িত্ব কারা পালন করেছিল? ভিন্ন কোনো শিক্ষিত নারী?

যদি পারিবারিক অশান্তি, অমিল সর্বোপরি পারিবারিক যাবতীয় সমস্যার প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয় তাহলে দেখা যাবে, এসবের অধিকাংশই কলেজ-ভার্সিটি পাশ করা শিক্ষিত নারীদের মাধ্যমেই সংঘটিত হচ্ছে। এখানে আমি শিক্ষার ব্যাপারে বিরূপ কোনো মন্তব্য করছি না এবং নারীশিক্ষার বিরুদ্ধেও বলছি না। তবে যে শিক্ষা নারীকে সন্তান প্রতিপালন, পরিবার পরিচালনা এবং স্বামীর আনুগত্যের ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলবে সেটা ঐ শিক্ষা নয় যা স্ত্রীকে স্বামীর মুখোমুখি হয়ে তাচ্ছিল্যের সুরে কথা বলতে সহায়তা করবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান যখন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তখন তার বয়স হয়েছিলো ১৮ বছর এবং তার স্ত্রীর বয়স হয়েছিল মাত্র ৮ বছর। অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে তিনি বেশ আয়েশী উপস্থাপনায় তার বিবাহ বয়স নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি বলেন, একটা ঘটনা লেখা দরকার, নিশ্চয়ই অনেকে আশ্চর্য হবেন। আমার যখন বিবাহ হয় তখন আমার বয়স বারো তেরো হতে পারে। রেণুর বাবা মারা যাবার পরে ওর দাদা আমার আব্বাকে ডেকে বললেন, 'তোমার বড় ছেলের সাথে আমার এক নাতনীর বিবাহ দিতে হবে। কারণ, আমি সমস্ত সম্পত্তি ওদের দুই বোনকে লিখে দিয়ে যাব।' রেণুর দাদা আমার আব্বার চাচা। মুরব্বির

হুকুম মানার জন্যই রেণুর সাথে আমার বিবাহ রেজিস্ট্রি করে ফেলা হলো। রেণুর বয়স তখন বোধ হয় তিন বছর হবে।

স্পেনের ক্যাথলিক গির্জা থেকে বিবাহের বয়স নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, বিবাহ চুক্তি শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, বরের বয়স ন্যূনপক্ষে ১৪ এবং কনের বয়স ১২ হতে হবে। তেমনিভাবে আমেরিকার অ্যারিজোনা, ফ্লোরিডা, আইডাহো রাজ্যের বিবাহ আইনেও বলা হয়েছে, বিবাহের ক্ষেত্রে বরের বয়স ন্যূনপক্ষে ১৪ এবং কনের বয়স ১২ হতে হবে।

আমেরিকার কলোরাডো রাজ্যের বিবাহ আইনে বলা হয়েছে, বিবাহের ক্ষেত্রে বরের ২১ কনের ১২ বছর পূর্ণ হতে হবে।

যুগোস্লাভিয়ার বিবাহ আইনে বলা হয়েছে, ছেলের ১৫ এবং মেয়ের ১৩ বছর পূর্ণ হতে হবে।

ইতালির বিবাহ আইনে বলা হয়েছে, ছেলের ১৬ এবং মেয়ের ১৪ বছর পূর্ণ হতে হবে।

জাপানের বিবাহ আইনে ১৭ এবং ১৫ বছর করা হয়েছে।

ইহুদী ধর্মে বিবাহের ক্ষেত্রে ছেলের বয়স ১৮ এবং মেয়ের বয়স ১৩ করার বিধান রাখা হয়েছে।

অন্যদিকে বাংলার হিন্দু পরিবারগুলোর মাঝে প্রাচীনকাল থেকেই বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। হিন্দু সমাজে ছেলেমেয়েদের বিশেষ করে মেয়েদের, বাল্যকালে বয়ঃসন্ধির পূর্বেই বিবাহ দেয়াকে ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করা হতো। প্রচীন হিন্দু আইনপ্রণেতা মনু নারীর বিয়ের বয়সের যে বিধান দিয়েছেন, তা হলো ত্রিশ বছরের পুরুষ বারো বছরের কন্যাকে বিয়ে করবে। চব্বিশ বছরের পুরুষ আট বছরের কন্যাকে বিয়ে করবে, নইলে ধর্ম লঙ্ঘিত হয়।

আরবের দৈনিক আঞ্চলিক পত্রিকা আল-হায়াতে রোচেস্টার/রোচেসরাজ ভার্সিটির নারী গবেষণা কেন্দ্রের একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, বর্তমানে আমেরিকায় বিবাহের হার আশঙ্কাজনক হারে হ্রাস পাচ্ছে। হ্রাস পাওয়ার কারণ হলো: আমেরিকানরা বিয়ের বয়সকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। আগে ২০-২৫ বছর ছিলো বিয়পর গড় বয়স এখন তা বেড়ে ২৫-৩০ হয়ে গেছে।

মানুষের বয়স যত বৃদ্ধি পেতে থাকে ততই তার বিয়ের প্রতি চাহিদা/আকর্ষণ কমে যায়। আমেরিকা য় প্রায় ২৫-৩০% সন্তানের জন্ম হয় বিবাহ ছাড়াই।

এখন বিয়ে ছাড়াই নারী-পুরুষ যৌন জীবন যাপন করছে, সন্তান জন্ম দিচ্ছে তারপর ইচ্ছে হলে বিয়ে করছে অথবা অন্য কোনো সাথীর সাথে চলে যাচ্ছে।

নারী পুরুষের যৌনজীবন একপ্রকৃতির নয় গড়পরতা মেয়েদের প্রজনন ক্ষমতা ৪৫ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। একজন নারী তার যৌনজীবনে প্রায় চারশ'র মতো ডিম্বকোষ উৎপাদন করতে পারে। পক্ষান্তরে পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা মেয়েদের মত এতোটা সীমিত নয়। বৃদ্ধ বয়সেও পুরুষের শুক্রকীট উৎপাদনক্ষমতা সচল থাকে। মেয়েদের জীবনে পুরুষের তুলনায় বার্ধক্য আসে অতি দ্রুত। তাই বৃদ্ধা নারীর গড়পরতা বৃদ্ধি সব দেশেই

বেশি দেখা যায়। পৃথিবীতে বৃদ্ধ পুরুষের তুলনায় বৃদ্ধা নারীর সংখ্যাই বেশি। মানসিক দিক থেকেও নর-নারীর বিকাশ-বৃদ্ধি একরকম নয়। ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা কথা বলতে শেখে আগে। তারা সংসার সম্বন্ধেও অভিজ্ঞ হয়ে উঠে ছেলেদের আগে। তাই ছেলে-মেয়ের মানসিক ও জৈবিক বয়সকে একাকার করে দেখতে চাওয়া বিজ্ঞানসম্মত নয়। ছেলে-মেয়ের ক্ষেত্রে ন্যূনতম বিবাহ বয়স নির্ধারণ করতে হলে মানব জীবনের এসব জৈব বাস্তবতাকে বিবেচনায় নিতে হবে।

নারীবাদের ছায়ায় ভাঙছে পরিবার:

নারীবাদীদের তথাকথিত সমতার আন্দোলন এখন রুপ নিয়েছে স্বার্থ সিদ্ধি, প্রতিযোগিতা ও আধিপত্যে। সংসার যেখানে ভালোবাসা, সহযোগিতা ও পরস্পরের প্রতি সম্মানের সেখানে এখন শুরু হয়েছে প্রতিযোগিতা। স্ত্রী এই এই কাজ করল তো স্বামীকেও এই এই কাজ করতে হবে। স্ত্রী বনাম স্বামী হয়ে গেছে। যেনো সংসার নয় কোনো ফুটবলের ম্যাচ। পারস্পারিক এই প্রতিযোগিতার কারণে বাড়ছে দ্বন্দ ও বিচ্ছেদ।

নারীবাদ নারীদের শিখিয়েছে তারা কারো অধীনে থাকতে বাধ্য নয়। নিজের জীবনে যা খুশি তাই তারা করতে পারে। কোনো ঘটনার দায় ভার নেওয়া তার জন্য জুরুরি নয়। সংসারের চাইতে জুরুরি হলো চাকরি/কামাই করা। এখন তো অনেকে এটাও প্রচার করে যে, 'কামাই থাকলে জামাই লাগে না'। কি অদ্ভুত!! একজন জীবন সঙ্গীর প্রয়োজন কি টাকা দিয়ে পুরণ হয়?? নাকি সবার জন্য অবৈধ সম্পর্কে থাকা বাধ্যতামুলক!!

নারীবাদীতা নারীদের কারো উপদেশ গ্রহণ করতে দিতেও রাজী নয়। তাকে যদি বলা হয় ডানে যেও না ওখানে গোবর আছে, সে ডানেই যাবে কারণ তাকে ডানে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। আচ্ছা একজন অবিভাবক নিশ্চয় খারাপ চাইবে না। স্বামী তো বিয়ের পর নারীর অবিভাবক। তাহলে স্বামীর আদেশ-নিষেধ মানতে অসুবিধা কোথায়?!

আল্লাহ পাক কুরআনে বলেছেন-

"পুরুষ হলো নারীর অভিভাবক, কারণ আল্লাহ একজনকে অন্যের উপর শ্রেষ্ঠতা দিয়েছেন।" (সুরা আন-নিসা ৪:৩৪)

এখানে শ্রেষ্ঠতা মানে হলো দায়িত্ব-কর্তব্য। নারীর ভরণপোষণের দায়িত্ব, সামাজিক স্বীকৃতি, যেকোনো প্রতিকূলতা থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব তার স্বামীর,বাবার, ভাইয়ের।

শুধু অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হলেই কি একটি নারী সব দিক থেকে নিরাপদ থাকতে পারে?! এমন কত নারী নির্যাতনের নমুনা রয়েছে শারীরিক ও মানসিক যারা নিজেরা মাস গেলে ভালো অংকের বেতন পায়। বরঞ্চ কিছু কিছু নিকৃষ্ট পুরুষ রয়েছে তারা তাদের দায়িত্বে থাকা নারীর ইনকামে বিলাসিতা করে।

নারীবাদীরা বলে নারীদের অর্থ উপার্জন করতে বলে। কারো উপর নির্ভর হতে মানা করে। যখন স্বামী স্ত্রী উভয় বাইরে কাজ করে তখন শুরু হয় দ্বন্দ। স্বামী দাবী করে সে তো তার ভাগের কাজ করছেই তাহলে সে কেনো বাসায় কাজ করবে বা হেল্প করবে। অপরদিকে নারী নিজেও বাইরে কাজ করে এসে সংসারের দায়িত্ব পালন করতে চায় না। এভাবে আস্তে আস্তে সংসারে বিচ্ছেদ ঘটে।

এখন মেয়েদের মগজ এমন ভাবে ধোলাই করা হয়েছে যে যেই মেয়ের কোনো অর্থনৈতিক ব্যাকআপ থাকবে না সে সমাজে অবহেলার পাত্রি থাকবে।

ইসলামে নারীকে সম্মানিত করা হয়েছে মা, স্ত্রী, কন্যা ও বোন হিসেবে।

তাঁর ভূমিকা সমাজের কেন্দ্রে, কিন্তু নেতৃত্ব ও দায়িত্বের ক্ষেত্র আলাদা।
ফেমিনিজম এই ভারসাম্য ভেঙে দিয়েছে- নারীকে এমন এক প্রতিযোগিতায় নামিয়েছে যেখানে সে না ঘর পায়, না শান্তি।
প্রিয় নবী ﷺ বলেছেন -
"তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ করে।" (তিরমিজি)
শুধু স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণে একজন ব্যক্তি উত্তম হতে পারে তাহলে নারীর মর্যাদা কত উপরে!!
শুধু চাকুরী বা ব্যবসা করার জন্যই নয় অনেকে নারীবাদী ধ্যানধারণার জন্য পরিবারের বন্ধন ভেঙে ফেলছে। তাদের মতে ঘরের কাজ করাটা নিম্নপর্যায়ের কাজ। স্বামীর সেবা করা তো দূরের কথা নিজ সন্তানের দায়িত্ব নিতেও রাজী নয়। সন্তান বড় হচ্ছে মার ভালোবাসা ছাড়াই আয়ার কাছে। চাকুরীজীবী নারী বা গৃহিণী হোক এখন পরিকিয়া ডাল-ভাত হয়ে গেছে ফেমিনিস্ট সোসাইটিতে। যতদিন প্রকাশ পায় না ততদিন গোপনে চলে এই ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড। আর প্রকাশ পাওয়ার পর স্বামীর বিরুদ্ধে হেনতেন অভিযোগ তুলে বিচ্ছেদ সাথে এত এত টাকা দাবী।
কিছু কিছু মানুষের এইসব ধারণার জন্য সমাজের অধিকাংশ নারী ভুক্তভোগী হচ্ছে।
ফেমিনিজম সবার মাথায় এমন ভাবে বসে গেছে যে এখন নারীর জন্য অর্থ উপার্জন বাধ্যতামুলক ধরে নিয়েছে। তাই যারা উপার্জন না করে ঘরে মনোযোগ দেয় তাদের হেয় প্রতিপন্ন করে। পরিবার গুলো যখন দেখে অমুকের স্ত্রী এত টাকা কামাই করে তখন নিজের ঘরের রাণীকে অকর্মক মনে হয়। অথচ তারা কিন্তু নিজের দায়িত্ব ঠিকই পালন করছে।
নারীবাদীদের জন্য বাকী নারীরাও ভুক্তভোগী হচ্ছে।
একজন নারী যার সংসারের সব কাজ সামলাতে হয় যতই তার জন্য গৃহপরিচারিকা থাকুক। তাকেই সব দিক গুছাতে হয়। স্বামী সহযোগিতা করলেও নারীকেই সবদিকে নজর রাখতে হয়। গর্ভধারণ, শিশুর যত্ন, খাবার, কাপড়চোপড় সবকিছু সামলায় তাকে বাইরের কাজ ও যদি করতে হয় তবে কি তার জীবনে কুলায়?
আমি নারী আমি আসলেই কি সব পারি?!!
৯-৫টা যদি অফিসে দিতে হয় তবে আরও আগে বের হতে হবে। সকালের নাস্তা, দুপুরের খাবার এসবের ব্যবস্থাও করতে হবে। ৫ টায় ছুটি হলেও আসতে আরও দেরি হবে। এসে রাতের রান্নার যোগাড়, বাসা অর্গানাইজ করা আর বাচ্চা থাকলে তো কথাই নেই। এসব তো নারীর উপর নারী নিজেই জুলুম করছে। এত কিছু করে স্বভাবতই কোনো নারীই চাইবে না কারো আন্ডারে থেকে কোনো কথা শুনতে। কাজের প্রতি নিজের ডেডিকেশন দিতে গিয়ে সংসারের প্রতি অমনোযোগীতা বেড়ে যায়। শুরু হয় তর্ক, ঝগড়া শেষ হয় বিচ্ছেদের মাধ্যমে।

ইউরোপ ও আমেরিকায় নারীবাদের জোরালো উত্থানের পর পারিবারিক জীবন ভাঙনের হার নাটকীয়ভাবে বেড়েছে।

“No-fault divorce law” (যেখানে যেকোনো পক্ষ কারণ ছাড়াই ডিভোর্স দিতে পারে) এ ধারণা এসেছে নারীবাদের চাপ থেকেই।

বাংলাদেশ, ভারত বা মধ্যপ্রাচ্যেও যখন ফেমিনিজমের প্রভাব মিডিয়া ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ছড়াতে শুরু করল, তখনই শহরাঞ্চলে ডিভোর্স হার দ্রুত বাড়তে শুরু করেছে।

উদাহরণ: ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে প্রতি মাসে গড়ে ৩০০০–৪০০০ ডিভোর্স আবেদন জমা পড়ে (সূত্র: ডিএনসিসি রিপোর্ট, ২০২৪)।

ডিভোর্স শুধু দুইজনের বিচ্ছেদ নয়, এটা সমাজ ও সন্তানের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে।

যতক্ষণ না আমরা ইসলামি মূল্যবোধ ও পারিবারিক দায়িত্ববোধে ফিরে আসি,

ততদিন ফেমিনিজমের ছায়ায় সংসার ভাঙন চলতেই থাকবে।

বেকারত্বের হার বৃদ্ধি ও কর্মের মুল্য হ্রাস:

আল্লাহ তায়ালা পুরুষের ফিতরাত এমন করেছেন যে সে ঘরের বাইরে কাজ করতে পারে। নিজের জন্য, পরিবারের জন্য উপার্জন করতে পারে, পরিবারের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে। আদিকাল থেকে এটাই হয়ে আসছে। এমনকি বিভিন্ন উপজাতি যারা আধুনিক জগত থেকে একেবারেই বিছিন্ন তাদের সমাজের দিকে দেখলেও দেখা যায় পুরুষরা শিকার করে, বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, যেকোনো বিপদের আশংকা করলেই নিজ পরিবার ও গোষ্ঠীকে বাচাঁনোর জন্য সর্তক থাকে।

একজন পুরুষ উপার্জন করলে সেই উপার্জন কিন্তু সে একা ভোগ করেনা। নিজের পরিবার - বাবা মা, ছোট ভাই বোন, স্ত্রী সন্তান সবার জন্যই সে উপার্জন করে। কিন্তু একজন নারী যার উপর কারো দায়িত্ব নেই সে এই অর্থ দিয়ে কি করবে? শুধু নিজের প্রয়োজন, শখ বিলাসতা পুরণ?!

যে নারীদের উপার্জনক্ষম কোনো মাহরাম নেই তাদের জন্য বিষয় আলাদা। তারা নিজের ও পরিবারের জন্য উপার্জন করে। কিন্তু যাদের প্রয়োজন নেই তারা আবার অজুহাত তৈরি করে।

যে চাকুরী একটা ছেলের হলে একটা পরিবারের হাল ধরতে পারত সেই চাকুরীই যদি অন্য একটা মেয়ে করে নিজের মেরুদণ্ড সোজা করার জন্য তাহলে কি সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা হলো?!

অনার্স- মাস্টার্স করার পরেও কত কত ছেলে চাকুরীর জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে কিন্তু পাচ্ছে না। এত পুজিও নেই নিজের বিজনেস চালু করার। পরিবারসহ হতাশায় ভুগছে। একজন মেয়ের জন্য কিন্তু অনার্স-মাস্টার্স করার পরেও চাকুরী না হলেও কোনো সমস্যা নেই। বিয়ে করে সে সেটেল্ড হতে পারে। তবুও তারা নারী কোটা দিয়ে চাকুরী নিয়ে ছেলেদের বঞ্চিত করছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর তথ্য অনুয়ায়ী দেশে বর্তমানে প্রায় ৩০-৩৫ লক্ষ বেকার রয়েছে। এই সংখ্যা আরও বাড়ার আশংকা করা যায়।

নারীর ক্ষমতায়ন করতে গিয়ে কর্মের মূল্য কমে গিয়েছে। উদাহরণ স্বরুপ- আগে যেখানে একজন পুরুষ সারাদিন কাজ করে পেত ৬০০-৭০০ টাকা সেখানে এখন নারীরাও কাজ করছে। যার কারণে পুরুষ পায় ৩০০ এবং নারী পায় ২৫০ টাকা। যদি স্বামী স্ত্রী উভয়ই কাজ করে তবুও ৫৫০ টাকা হয় যা স্বামীর আগের একার কামাই থেকে কম। এই নীতি ছোট-বড়, সরকারি-বেসরকারি সব কর্মক্ষেত্রেই প্রয়োগ হচ্ছে।

গবেষণায় বলে যে একজন পুরুষের সমস্যা সমাধানের সামর্থ মহিলার চাইতে বেশি। তারা সহজেই অনেক সমস্যার সমাধান বের করতে পারে। প্রতিকূল পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেওয়া তাদের জন্য সহজতর। যেকোনো মানসিক চাপ ও তারা নারীর তুলনায় বেশি সহ্য করতে

পারে। অন্যদিকে নারী হলো নমনীয়। তারা একটুতেই ভেঙে পড়ে। হরমোনাল ইমব্যালেন্সের সাথে সাথে তাদের মানসিক স্থিতিও পরিবর্তিত হয়। তাহলে সহজাতই একজন ছেলে মেয়ের তুলনায় অধিক যোগ্য বাইরের কাজের জন্য।

তবুও কোটি কোটি নারী ঘর ছেড়ে শ্রমবাজারে নেমেছে। আগে যারা পরিবার, সমাজ ও শিশুর ভবিষ্যৎ গঠনে ভুমিকা রাখত তারাই আজ পুরুষের সাথে অসুস্থ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত।

ফেমিনিজম শেখায় -

“নারী ও পুরুষ সমান, তাই কেউ কারও অধীন নয়।”

কিন্তু বাস্তবে, সব কাজ বা দায়িত্ব জৈবিক ও মানসিকভাবে সমানভাবে উপযুক্ত নয়।

যখন নারী পুরুষের ক্ষেত্র দখল করে, তখন অনেক পুরুষ পিছিয়ে যায় -

তারা নতুন সুযোগ না পেয়ে হতাশ হয়, সমাজে বেকরত্বের হার ও মানসিক হতাশা বাড়ায়।

একটি বাস্তব উদাহরণ:

জাপানে “Gender Equality Policy” চালুর পর, নারী কর্মসংস্থান বেড়েছে, কিন্তু একই সময়ে তরুণ পুরুষদের কর্মহীনতার হার ৩০% পর্যন্ত বেড়েছে (JILPT Report, 2022)।

কারণ কোম্পানিগুলো নারীদের জন্য quota রাখে, ফলে অনেক যোগ্য পুরুষ চাকরি হারায়।

নারীবাদীদের কাছে সব কাজের বিনিময় শুধু মাত্র অর্থ। তারা বলে, “ঘরের কাজের মূল্য নেই।” কিন্তু বাস্তবতা তো উল্টো। ঘরের কাজের মূল্য তো কখনো গণনাই করা যাবে না। একজন নারী ঘরের যত কাজ করবে প্রত্যেক কাজের জন্য তার নেকী হাসিল হবে।

যেমন নবীজী (সাঃ) বলেছেন-

“যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, রমজানের রোযা রাখে, তার সতীত্ব রক্ষা করে ও স্বামীর আনুগত্য করে — সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”

(সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও মুসনাদে আহমদ)

বাংলাদেশে নারী কর্মসংস্থান বেড়েছে, কিন্তু একই সঙ্গে শিক্ষিত তরুণ বেকারত্বও বেড়েছে।

অনেক নারী চাকরির বাজারে এসেও “career gap” বা “work-life conflict”-এর কারণে স্থায়ী অবস্থান রাখতে পারে না।

এর ফলে প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন কর্মী বারবার নিয়োগ দিতে বাধ্য হয় — চাকরির স্থিতি ও দক্ষতা দুই-ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অর্থাৎ, নারীবাদের প্রভাবে শ্রমবাজারে অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা বেড়েছে।

নারীবাদ প্রথমে যে “সমতা”র কথা বলেছিল, তা বাস্তবে অসামঞ্জস্যে রূপ নিয়েছে।

শ্রমবাজারে অতি প্রতিযোগিতা, পারিবারিক দায়িত্ববোধের ক্ষয়, এবং অর্থনৈতিক ভারসাম্যের অভাব।

সব মিলিয়ে নারীবাদ বেকারত্ব বৃদ্ধির এক নীরব কারণ।

সহশিক্ষায় নারীবাদের প্রভাব:

ইসলাম নারী ও পুরুষের দৃষ্টির হেফাজত করতে বলেছে। অপর লিঙ্গ থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে বলেছে। অশালীন আচরণ করা থেকে বিরত থাকতে বলেছে। যেমন কুরআনে আল্লাহ বলেন-

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ
وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

"বল, মুমিন পুরুষদেরকে যেন তারা তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং লজ্জাস্থান হেফাজত করে।আর বল, মুমিন নারীদেরকে যেন তারা তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং লজ্জাস্থান হেফাজত করে।"

(সুরা আন-নূর ২৪:৩০-৩১)

সহশিক্ষাতে কি এসব মেনে চলা হয়?! সহশিক্ষায় ছেলে মেয়ে একসাথে ক্লাস করে, আড্ডা দেয়। গায়রে মাহরামের সাথে ঘুরতেও যায়। আবার অনেকে প্রেমের সম্পর্কে জড়ায়।
হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন -

"লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।"

(সহীহ বুখারী, হাদীস: ৯)

যখন কেউ বিপরীত লিঙ্গের সংস্পর্শে আসে তখন স্বভাবতই তার হায়া কমে যায়। ধীরে হয়ে উঠে বেলাজ, বেহায়া।
রাসুল (সাঃ) বলেছেন-

"আমি তোমাদের পরে এমন কোনো ফিতনা রেখে যাচ্ছি না, যা নারীদের ফিতনার চেয়ে বেশি ক্ষতিকর পুরুষদের জন্য।"

(সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

যখন স্পষ্টতই সাবধান করে দেওয়া হয়েছে তার পরেও যদি সহশিক্ষায় কেউ থাকে সেও ফেতনায় পতিত হবে।
প্রাচীন ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা যেমন - মাদরাসা, কুতুবখানা, দারুল উলুম সবগুলোতেই নারী ও পুরুষের শিক্ষা ছিল আলাদা।
নারীরা আলাদা পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণ করতেন, এবং অনেক মহিলা আলেমা ছিলেন (যেমন: আয়িশা (রাঃ), উম্মে সালমা (রাঃ), ফাতিমা আল-ফিহরী)।
কিন্তু তাঁরা কখনো পুরুষদের সঙ্গে মিশে একসাথে শিক্ষা গ্রহণ করতেন না।
এমনকি আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) এর কাছে অনেকে হাদিস শিখতে আসতেন থখন তিনি পর্দার আড়ালে নিজের কণ্ঠস্বরকে বিকৃত করে কথা বলতেন যাতে ফেতনার কোনো আশংকা না থাকে।

সহশিক্ষা ব্যবস্থার কারণে আজ দেখা যায় -
বিশ্ববিদ্যালয়ে অশালীনতা, প্রেম-সম্পর্ক, জিনা ইত্যাদির হার বেড়েছে।
শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে গেছে, "ফ্যাশন" ও "মেলামেশা" প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে।
মানসিক বিভ্রান্তি ও নৈতিক অবক্ষয় বেড়েছে।
এই কারণে ইসলামী চিন্তাবিদ ও আলেমরা বলেন -
"যে শিক্ষা লজ্জা নষ্ট করে, সেটি শিক্ষা নয় বরং ফিতনার দরজা।"
সহশিক্ষা ইসলামি দৃষ্টিতে হারাম বা অন্তত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ কারণ:
এটি গায়র-মাহরামের মেলামেশা ঘটায় পর্দা ও লজ্জাশীলতার আদেশ লঙ্ঘন করে ফিতনা ও অশ্লীলতার পথ খুলে দেয় এবং সমাজে নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি করে।
ইসলাম শিক্ষা দিতে নিষেধ করেনি,বরং শর্ত দিয়েছে -
"শিক্ষা হোক জ্ঞান ও তাকওয়ার ভিত্তিতে, নয় প্রলোভনের মাধ্যমে।"
২০২১ সালে আফগানিস্তানে তালিবানরা মার্কিনীদের ভাগিয়ে শরিয়াহ শাসন প্রতিষ্ঠা করে। তখন থেকেই পশ্চিমা, নারীবাদী ও সেক্যুলারদের মাথায় আগুন। তারা ছড়াচ্ছে যে আফগানিস্তান এ নাকি নারী শিক্ষা নিষিদ্ধ করেছে তালিবান। আসলে সত্য হলো সেখানে শরীয়াহ কায়েমের পর থেকেই যাবতীয় হারাম নিষিদ্ধ। সহশিক্ষা বাদ দেওয়া হয়েছে। শুরুর দিকে একই ক্লাসে পর্দা দিয়ে আলাদা করে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা হলেও এখন মেয়েদের শিক্ষা একেবারে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। মানে যেখানে নারী পড়ালেখা করে সেখানে শিক্ষক থেকে শুরু করে দারোয়ান পর্যন্ত নারী। ফলে যিনা নেই, ব্যভিচার নেই। নারীদের যতদূর ইচ্ছা ততদূর তারা পড়তে পারবে। এতে কোনো বাধা নেই।
এতেই তো নারীবাদীরা ফুসে উঠেছে। আসলে নারীর সত্যিকার কোনো উন্নতি হোক বা নারীরা নিরাপদ থাকুক এটা নারীবাদীরা চায় না।

নারীক্ষমতায়নের প্রভাব সন্তানের উপর:

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন -
"নারী তার স্বামীর ঘর ও সন্তানদের দায়িত্বশীল রাখালী।"
(সহীহ বুখারী, হাদীস: ৮৯৩)
আল্লাহ নারীকে এমন ফিতরাতে তৈরি করেছেন যে সে ঘরের ভিতরে থাকবে। সংসার ও বাচ্চার দেখাশোনা করবে। এইকাজের বিনিময়ে সে পুরষ্কৃত হবে।
হাদিসে এসেছে -

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
"إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا :ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ"

অর্থ:
"যে নারী তার পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, রমজানের রোযা রাখে, তার লজ্জাস্থানের হিফাজত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে, তাকে বলা হবে — 'তুমি জান্নাতের যেকোনো দরজা দিয়ে ইচ্ছা করলে প্রবেশ করো।'"
সহীহ ইবনু হিব্বান: হাদীস ৪১৬৩
মুসনাদ আহমদ: হাদীস ১৬৬১
সহীহ আল-জামি': হাদীস ৬৬০
সুবহানাল্লাহ!! শুধুমাত্র নামাজ, রোজা, লজ্জাস্থানের হিফাজত এবং স্বামীর আনুগত্যের কারণে একজন নারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। ইসলাম নারীর জন্য কত সহজ করে দিছে। তবুও নারীবাদীদের চক্করে আজ প্রায় অধিকাংশ নারীরা নারী ক্ষমতায়নের ফাঁদে।
যেখানে বিনা প্রয়োজনে নারীর জন্য বাইরে বের হওয়া নিষেধ সেখানে স্রেফ নারীক্ষমতায়নের কারণে লক্ষ লক্ষ নারী আজ ঘরের বাইরে। আর এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ছে শিশুদের উপর। একটি শিশুর জন্য সবচেয়ে ভরসার জায়গা তার মা। শিশুর জন্য সবচেয়ে উত্তম শিক্ষক হলো মা। কিন্তু নারী এখন বাইরের কাজের চক্করে সেই শিশুকেই অবহেলা করছে।
যেই নারীদের অন্য কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নেই যেমন- বিধবা, বাবা বা বড় ভাই নেই বা থাকলেও কর্মের জন্য উপযোগী নয় সেই নারীদের শরীয়াহর দায়রায় থেকে কাজ করা জায়েজ।
কিন্তু আমরা বর্তমানে যে working women দেখছি এদের অধিকাংশই নিজেকে সমাজের কাছে নিজেকে প্রমাণ করতে, সেচ্ছাচারীতা চালানোর জন্য চাকুরী বা ব্যবসা করে।
যে নারীরা চাকরী বা বাইরে গিয়ে কাজ করছে তাদের শিশুরা হয় দাদা-দাদীর, নানা-নানির নয়তো গৃহকর্মীর কাছে বড় হচ্ছে।

দাদা-দাদী বা নানা-নানি কি বর্তমান যুগের শিশুদের সঠিকভাবে সামলাতে পারে? আর তাদের কি বয়স বাচ্চা লালন-পালন করার?! তারা তো নিজেদের সন্তানদের বড় করেছেন। এখন তো তাদের নির্বিঘ্নে, নিশ্চিতে থাকার সময়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানুষের সহনশীলতা কমে যায়। অল্পতেই রেগে যায়। বলা হয় যে শেষ বয়সে মানুষ শিশুর মত হয়ে যায়। তো এই বয়সে এসে যখন তারা নাতিনাতনিদের পালন করতে গিয়ে একটু ভুল হলে বা বিরক্ত হলেই নারীবাদী working women বউমা বা মেয়ে তাদের উপর চড়াও হয়। আবার আরেক দল আছে তারা গৃহকর্মীর কাছে সন্তান রেখে যায়। একটা শিক্ষিত পরিবার, শিক্ষিত মা শিশুকে যে শিক্ষা দিবে সেই শিক্ষা কি একজন গৃহকর্মী পারবে?! ব্যাপার টা হলো যে বাবা-মা দেশের উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রী অর্জন করলেও তাদের সন্তান গৃহকর্মীর শিক্ষা-দিক্ষার বড় হচ্ছে, তাদের আদর্শে বড় হচ্ছে।

একজন নারী মা হওয়ার পরে তার শরীর আগের মত হতে কমপক্ষে ১ বছর সময় লাগে। ব্রেস্টফিডিং করানোও একটি ক্লান্তিকর কাজ। তার মধ্যে যখন একজন মা সারাদিন বাইরে থেকে বাসায় আসে স্বাভাবিকভাবেই সে ক্লান্ত থাকবে। সেসময় বাচ্চার আবদার বা দুষ্টুমি সহ্য হয় কতজনের?!

মায়ের ব্যস্ততার কারণে সন্তানের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ কমে যায়। ফলে সন্তান অনেক সময় মানসিকভাবে একা বোধ করে, এমনকি আচরণগত সমস্যা বা নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ছোট শিশুরা বিশেষত মায়ের স্নেহ ও তত্ত্বাবধান থেকে বঞ্চিত হয়।

সন্তান জীবনের প্রথম শিক্ষক হলো তার মা। তাই মায়ের উপস্থিতি ও যত্ন সন্তানের মানসিক বিকাশে গভীর ভূমিকা রাখে। যখন মা অফিস, কাজ বা ক্যারিয়ারে বেশি সময় ব্যয় করেন, তখন শিশুর আবেগগত চাহিদা পূরণ হয় না। এতে শিশু হয়তো আত্মবিশ্বাস হারায়, অন্তর্মুখী হয়ে পড়ে বা বাইরে খারাপ প্রভাবে পড়তে পারে।

মায়ের প্রধান দায়িত্ব হলো সন্তান প্রতিপালন ও পরিবারের সুষ্ঠু পরিচালনা। তাই কোনো কাজ যদি এই দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি করে, তবে তা ইসলাম সমর্থন করে না।

একজন মায়ের কাছে সবচেয়ে দামী হলো সন্তান। নারীবাদের পাল্লায় পড়ে আজ সেই সন্তানই পাচ্ছে অবহেলা। অনেকে এটা বলে জাস্টিফাই করে যে সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য এসব করছি। প্রকৃতপক্ষে সন্তানের ভবিষ্যত তো তাকে সুশিক্ষায় বড় করা। পুথিগত বিদ্যা নয়, বাস্তবিক জ্ঞান, ধর্মীয় মূল্যবোধের চর্চার মাধ্যমে তাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করা।

হিজাবি ফেমিনিস্ট :

ফেমিনিজম এর এজেন্ডা এতোটাই সুক্ষ্ম ভাবে মুসলিমদের মাথায় গেথে গিয়েছে যে তারা মনে করছে পর্দা করে সব করা যায়। তাই মাথায় এক টুকরা কাপড় বেঁধে সেটার নাম দিয়েছে হিজাব। আর শুধু মাথা ঢেকেই ভাবছে যথেষ্ট। নিচে জিন্স আর গেন্জি পরে উপরে একটা ত্যানা পেচিয়ে বেড়ানোর নাম হয়েছে পর্দা করা। মেয়েরা মাথায় কাপড় পেচিয়ে ফুটবল খেলছে, ক্রিকেট খেলছে, অলিম্পিকে অংশ নিচ্ছে। এখন তো অভিনেত্রীরাও হিজাব পড়ছে। এদের নাম দিয়েছে প্রগ্রেসিভ মুসলিম।
মাথায় এক টুকরা কাপড় পেচানোকে যে হিজাব বা পর্দা করা বলে না। হিজাব হলো মুমিণনারীদের ভুষণ।

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ...

বাংলা অনুবাদ:

“আর মুমিন নারীদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে, লজ্জাস্থান রক্ষা করে এবং তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, যা স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায় তা ছাড়া; এবং তারা যেন তাদের ওড়না (খিমার) বুকের উপর (জয়ব) ফেলে রাখে।”

(সূরা আন-নূর, আয়াত ৩১)

সূরা-নুরের এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর থেকে নারী সাহাবীরা নিজের চাদর ছিড়ে মাথা ও বুক ঢেকেছিলেন।

আয়েশা (রাঃ) বলেন:

“যখন এই আয়াত (সূরা আন-নূর ৩১) নাযিল হয়, তখন আনসার নারীরা তাদের চাদর ছিঁড়ে নিয়ে নিজেদের মাথা ও বুক ঢেকে নেয়।”

(সহীহ বুখারী, হাদীস: ৪৭৫৮)

আবার সূরা আহযাবের নিম্নোক্ত আয়াত নাযিলের পর নারী সাহাবিগণ এমনভাবে চলতেন যে মনে হতো তাদের মাথায় কাক বসে আছে-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ...

বাংলা অনুবাদ:

“হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ এবং মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের জিলবাব (বড় চাদর) নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে করে তারা সহজেই চেনা যাবে এবং কষ্ট দেওয়া হবে না।”

(সূরা আল-আহযাব, আয়াত ৫৯)

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন:
“যখন এই আয়াত (আহযাব ৫৯) নাযিল হয়, তখন মদিনার নারীরা কালো কাপড়ে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে ঢেকে নেয়, যেন তাদের মাথায় কাক বসে আছে।”
(আবু দাউদ, হাদীস: ৪১০১)

এত এত নিদর্শন নারীর পর্দার জন্য তবুও মডারেট মুসলিমরা শুধু চুল ঢাকাকেই যথেষ্ট মনে করে।
এ তো গেলো মডারেট মুসলিমদের কথা। কিছু প্র্যাকটিসিং মুসলিমরাও এটা বিশ্বাস করে পর্দা করে সব করা যায়। বোরখা পড়ে বাইরে যাওয়া, গায়রে মাহরামের সাথে উঠাবসা করা, সহশিক্ষায় থাকা সবই করা জায়েজ তাদের মতে। অথচ হিজাব শুধু বাহ্যিক একটি বিষয় নয়। পর্দা যেমন শরীরের হয় তেমন মনের হয়, কন্ঠের হয়, চোখেরও হয়। মনের পর্দা হলো হায়া, লজ্জা। একজন নারী বোরখা পড়েও যখন বহু গায়রে মাহরামের সাথে মিলামেশা করে তখন তার হায়া কমে যায়, চোখের পর্দা লংঘন হয়, কন্ঠের পর্দার লংঘন হয়।
শরীয়াহর দায়রার থেকে যাদের জরুরত রয়েছে, যেমন - বিধবা, ডিভোর্সী, বাবা বা ভাই নেই থাকলেও কর্মক্ষমতা নেই সে নারীরা উপার্জন করতে পারবে। তার কাজের ক্ষেত্রে যদি গায়রে মাহরামের আনাগোনা না থাকে, ফেতনার আশংকা না থাকে, ঘরের হক্ক আদায়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা না থাকে তবে তার জন্য তা জায়েজ।
কিন্তু প্রতিটা মুসলিম ঘরের মেয়েদের কি একই অবস্থা?! অবশ্যই নয়। বাবা-মা নিজপরা প্র্যাকটিসিং হয়েও মেয়েদের বোরখা পড়িয়ে সহশিক্ষায় পাঠাচ্ছে। সহশিক্ষা হারাম!! আবার চাকরীও করতে দিচ্ছে। যাতে মেয়ের ভবিষ্যৎ ভালো হয়!! ভবিষ্যত কি চাকুরী বা ডিগ্রি দিয়ে নিশ্চিত করা যায়? সমাজে কত নারীই তো অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার পরেও শশুরবাড়ির নির্যাতন সহ্য করে।
মুসলিম নারীর কন্ঠেরও পর্দা আছে। আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) এর কাছে বহু সাহাবি হাদিস জানার জন্য আসতেন নবীজি (সাঃ) এর ইন্তেকালের পরে। তখন উনি দরজার আড়ালে থেকে নিজের কন্ঠকে বিকৃত করে কথা বলতেন যাতে উনার কন্ঠের দ্বারা কোনো ফেতনার সৃষ্টি না হয়। আবার নবীজি (সাঃ) এর রওজা মুবারক আয়েশা (রাঃ) এর ঘরে। যখন হযরত আবু বক্কর (রাঃ) কে সেখানে কবর দেওয়া হলো তখনও উনি ঘরের ভিতরে পর্দা ছাড়া থাকতেন। কিন্তু উমার (রাঃ) কে যখন দাফন করা হলো তারপর থেকে আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) ঘরের ভিতরেও পর্দা করতেন।
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন-

"যখন কোনো পুরুষ ও নারী একান্তে থাকে (খলওয়াতে যায়), তখন তাদের তৃতীয়জন হয় শয়তান।"

-সহীহ হাদীস

নারীরা পর্দা করেও কোনো গায়রে মাহরামের সাথে একাকী অবস্থান করা জায়েজ নেই। নবীজি (সাঃ) বলেছেন -

"নারী হচ্ছে 'আওরাহ' (অর্থাৎ ঢেকে রাখার বিষয়); যখন সে বাইরে বের হয়, তখন শয়তান তাকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে।"

— তিরমিজি, হাদীস ১১৭৩

নারীরা যখন ঘর থেকে বাইরে যায় তখন সবার চোখ তার উপরে থাকে। কুদৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে সহীহ পর্দা।

হাদিসে এসেছে -

"আল্লাহর পথে নিহত ব্যক্তি শহীদ, যে ব্যক্তি প্লেগে মারা যায় সে শহীদ, যে ব্যক্তি পেটে ব্যথা (অন্ত্রজনিত রোগ) বা গর্ভজনিত কারণে মারা যায় সে শহীদ, এবং যে নারী সন্তান প্রসবের সময় মারা যায়, সে-ও শহীদ।"

সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৩১১১,মুসনাদে আহমাদ (৬/৩৬৯), সহীহ ইবনে হিব্বান (২৯১৫)

নারীর জন্য যেমন সন্তান ধারণ ও জন্ম দেওয়া কষ্টের কাজ ঠিক তেমনই আল্লাহ পাক এই কষ্টের বিপরীতে এত নিয়ামত দান করেছেন।

পর্দা শুধু নিজের শরীরকে ঢাকা নয়। পর্দার সম্পর্ক আত্মার সাথে। পর্দার সম্পর্ক তাক্বওয়ার সাথে। বোরখা পড়ে শরীর ঢেকে হয়ত সব করা যায় কিন্তু পর্দা করে সব করা যায় না। নারীবাদীরা বলে ইসলাম নারীদের আটকে রাখে, তাদের জুলুম করে। ইসলামই নারীদের সঠিক মুল্যায়ন করে। নারীর মুক্তি নিজেকে বে-আব্রু করে প্রকাশ করার মাঝে নয়। নারীরা দামী রত্নের মত। তাদের ভালোর জন্যই তাদের ঢেকে রাখতে হয়। ইসলাম নারীকে শিক্ষিত হতে মানা করে না। সহশিক্ষাকে মানা করে। ইসলাম নারীদের নিজের মত প্রকাশে বাধা দেয় না। নিজেকে অপরের কাছে প্রদর্শনে বাধা দেয়। নারী নিজ গৃহে যেভাবে খুশি থাকতে পারে। যাদের সামনে যাওয়া জায়েজ তাদের সামনে যেতে পারবে।

ইসলাম নারীদের দিয়েছে সম্মান। তাই নারীকে বাইরে বের হয়ে নিজের জন্য উপার্জন করতে বলেনি। তার মাহরামের উপার্জনে তার হক্ক রয়েছে।

নারীবাদীতা এতটাই ব্রেইনওয়াশ করেছে যে মুসলিমরা না বুঝেই এই ফাঁদে পড়ে যাচ্ছে। আফসোস!!

ইহুদিদের চক্রান্তে নারীবাদ:

ইহুদিরা মুসলমানদের চিরশত্রু। নবীজী (সাঃ) এর সময় থেকেই তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করে আসছে। তারা যথখন দেখেছে যে মুসলমানের সংখ্যা অনেক বেশি ও শক্তিশালী হয়ে গেছে তখন থেকে তারা সরাসরি যুদ্ধ না করে মুসলিমদের ভিতরটাকে ফাঁপা করে দেওয়ার অভিযানে নেমেছে।

তারা ফেতনা-ফাসাদ, যিনা-ব্যভিচার, সুদ ইত্যাদি হারাম জিনিস মুসলিমের জীবনের অত্যাবশক করে দিয়েছে। তাদের সুক্ষ্ম পরিকল্পনার ফাঁদে যে সবাই বন্দি হয়েছে তা বুঝতেও পারে না।

একটি সমাজ গঠনের জন্য সবচেয়ে বড় কারিগর হলো একজন মা। তাই তারা নারীদের ঘর থেকে বের করেছে। নারীর ফিতরাতের বিপরীত কাজ তাকে দিয়ে করাচ্ছে। সামাজিক, ধার্মিক বা শারীরিক যেকোনো দিক থেকেই নারী-পুরুষের তুলনা করা অশোভনীয়। একজন নারী চাইলেই সব করতে পারেনা। যেমন একজন পুরুষ চাইলে গর্ভধারণ করতে পারেনা। তেমন নারীরাও চাইলে পুরুষের জন্য নির্ধারিত কাজ করতে পারে না। নারীবাদের মাধ্যমে এই চিরন্তন সত্যকে অস্বীকার করা হয়। ইহুদিদের চক্রান্ত এতটাই সুক্ষ্ম যে সরাসরি তাদের দোষারোপ করারও কোনো রাস্তা নেই। কারণ তারা দাবার গুটি হিসেবে তো নারীদের ব্যবহার করছে। মুসলিমদের ব্যবহার করছে। তারা শুধু পিছনে বসে গুটি চালছে।

১৮–১৯ শতকে ইউরোপ ও আমেরিকায় যে আধুনিক নারীবাদী আন্দোলন (Modern Feminism) শুরু হয়, তার প্রাথমিক ধাপেই কিছু ইহুদি নারী ও বুদ্ধিজীবী মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলো।

ইহুদি চিন্তাবিদরা “লিঙ্গসমতা, যৌনস্বাধীনতা, ও পিতৃতন্ত্রের বিরোধিতা”-এই ধারণাগুলোর তাত্ত্বিক ভিত্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলো।

কিছু ইহুদী নারীবাদী হলো-

Betty Friedan (১৯২১–২০০৬) The Feminine Mystique বইয়ের লেখিকা; যুক্তরাষ্ট্রে "Second-wave feminism" এর অন্যতম জননী।

Gloria Steinem (১৯৩৪–বর্তমান) নারীর মুক্তি আন্দোলনের বিশ্বনেত্রী; ম্যাগাজিন Ms.-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা।

Shulamith Firestone (১৯৪৫–২০১২)The Dialectic of Sex গ্রন্থে বলেছিলেন—পরিবার ও মাতৃত্ব নারীকে পুরুষের অধীনে রাখে।

Simone de Beauvoir (ইহুদি পরিবারে জন্ম, পরে ধর্মত্যাগী) (১৯০৮–১৯৮৬) The Second Sex গ্রন্থে আধুনিক নারীবাদের দার্শনিক ভিত্তি স্থাপন করেন।

এরা নিজেদের ধর্ম নিরপেক্ষ বললেও এদের মনোভাব তৈরি হয়েছে ইহুদি সম্প্রদায়ের থেকে।

এই আন্দোলনের গভীরে ছিল তিনটি মূল লক্ষ্য -

ধর্মীয় কর্তৃত্ব ভাঙা, পরিবারভিত্তিক সমাজ কাঠামো ভেঙে ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনধারা প্রচার, যৌন স্বাধীনতা ও শরীরের পূর্ণ মালিকানা দাবি

এই ধারণাগুলো ইহুদি সমাজে খ্রিস্টান আধিপত্যের প্রতিক্রিয়া হিসেবে জন্ম নেয়, কিন্তু পরবর্তীতে গোটা পশ্চিমা সভ্যতাকে ধর্মবিমুখতার দিকে ঠেলে দেয়।

ইসলাম নারীকে পরিপূর্ণ সম্মান দিয়েছে - কিন্তু তা আল্লাহর নির্ধারিত দায়িত্ব ও সীমার মধ্যে।

নারী-পুরুষ পরস্পরের সহযোগী ও পরিপূরক, প্রতিদ্বন্দ্বী নয়।

কিন্তু ইহুদি প্রভাবিত নারীবাদ এই সামঞ্জস্যকে নষ্ট করে নারীকে পুরুষের প্রতিযোগী করে তুলেছে,

ফলে সমাজে দেখা দিয়েছে পরিবার ভাঙন, নৈতিক অধঃপতন ও ধর্ম থেকে দূরত্ব।

আল্লাহ তাআলা বলেন -

"পুরুষেরা নারীদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত।"

সুরা আন-নিসা ৪:৩৪

আর নবীজী(সাঃ) বলেছেন-

"নারী তার স্বামীর ঘরে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"

সহীহ বুখারী, হাদীস ৮৯৩

ইহুদি চিন্তাবিদদের নেতৃত্বে শুরু হওয়া আধুনিক নারীবাদ আজ পশ্চিমা সমাজে ধর্ম, পরিবার ও নৈতিকতা ভেঙে দিয়েছে।

ইসলাম নারীকে যে সম্মান, নিরাপত্তা ও জান্নাতের পথ দিয়েছে, নারীবাদ সেই দিক থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

অতএব মুসলিম সমাজের উচিত পশ্চিমা নারীবাদের অন্ধ অনুকরণ না করে ইসলামী দৃষ্টিতে নারী মর্যাদা ও ভূমিকা পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা।

ইসলামে নারীর মর্যাদা :

ইসলামের আগে নারীর অবস্থা ছিলো শোচনীয়। নারীদের পন্যের মত ব্যবহার করা হতো। কন্যা সন্তানের জন্মকে অশনিসংকেত হিসেবে মানা হতো। কন্যা জন্মের লজ্জায় অনেকে জ্যান্ত পুতে ফেলত সদ্যজাত মেয়ে শিশুকে।

অতঃপর আল্লাহ পাক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মাধ্যমে ইসলামকে উপহার দিলেন। ইসলাম দিলো নারীকে সর্বোচ্চ সম্মান। সামাজিক মর্যাদা। পরিবারিক গুরুত্ব এবং খুব সহজেই জান্নাত লাভের উপায়।

নবীজী (সাঃ) বলেন-

যার ঘরে কন্যা সন্তান হয়, তারপর তাকে ভালোভাবে প্রতিপালন করে, তাহলে এ কন্যা তার জন্য জাহান্নাম থেকে বাঁচার দেয়াল হয়ে যাবে।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৬২৯]

হযরত আনাস বিন মালিক রাঃ থেকে বর্ণিত -রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন,

যে ব্যক্তি দু'টি কন্যা সন্তান প্রতিপালন করে। এমনকি তারা প্রাপ্ত বয়স্কা হয়ে যায়। তাহলে উক্ত ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আমাদের দুই আঙ্গুল যতটুকু কাছাকাছি সে আমার ততটুকু কাছে থাকবে।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৬৩১]

বিয়ের ক্ষেত্রেও নারীর মতামতের উপর জোর দিয়েছে ইসলাম। কুমারী মেয়ের মতামত এবং বিধবার ইচ্ছা ব্যতীত বিয়ে দেওয়া যাবেনা।

হাদিসে এসেছে -

কোন বিধবা নারীকে তার সম্মতি ব্যতীত বিয়ে দেয়া যাবে না এবং কুমারী মহিলাকে তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দিতে পারবে না।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৫১৩৬]

যেখানে বাকী সব ধর্মে মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার জন্য যৌতুক দিতে হয় সেখানে ইসলাম নারীকে মোহর দিয়ে বিয়ে করার নির্দেশ করেছে। এই টাকায় সম্পুর্ণ হক্ক শুধু কনের। তার যা ইচ্ছা করতে পারবে এই টাকা দিয়ে। আবার যে বিয়েতে মেয়ের বাবার খরচ কম হয় সেই বিয়েকে বরকতময় বলা হয়েছে।

কুরআন এ বলা হয়েছে -

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

অর্থ: আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও খুশীমনে।

[সূরা নিসা-৪]

ঘরের কাজে স্ত্রীকে সহযোগিতা করাও সুন্নাত। স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ আছে। কোনো ব্যক্তি উত্তম কিনা তা বুঝা যায় তার স্ত্রীর সাথে আচরণ কেমন তার ভিত্তিতে। যেমন-
হযরত আবূ হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন, মুমিনদের মধ্যে পূর্ণতর মুমিন সেই ব্যক্তি, যার আচার আচারণ উত্তম। আর তোমাদের মাঝে উত্তম সেই ব্যক্তি যে তার স্ত্রীদের কাছে উত্তম।
(সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং-৪১৭৬)
ছেলের মতো মেয়ের জন্যও সম্পত্তিতে অংশ আছে বাবা-মায়ের। স্বামীর সম্পদেও রয়েছে স্ত্রীর অংশ। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন-

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا [٤:٧]

পিতা-মাতা ও আত্নীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদেরও অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্নীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে; অল্প হোক কিংবা বেশী। এ অংশ নির্ধারিত।
[সূরা নিসা-৭]
একজন নারীর পুর্ণতা পায় মা হওয়ার মাঝে। মাতৃত্ব নারীকে সম্পুর্ণ করে। তাই তো ইসলাম মাকে দিয়েছে সীমাহীন মর্যাদা। সন্তান লালন-পালন করার বদৌলতে নারী পায় অসংখ্য সাওয়াব। মায়ের মর্যাদা কত তা নিম্নোক্ত হাদিসের দ্বারা বোঝা যায়-
হযরত আবূ হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল যে, পিতা মাতার মাঝে কে সবচে' বেশি উত্তম ব্যবহারের উপযুক্ত? নবীজী বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার বলল, তারপর কেন? নবীজী বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর কে? নবীজী বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর কে? নবীজী বললেন, তোমার বাবা।
[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৫৪৮]
শুধু কি তাই!? মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত বলা হয়েছে।
হযরত আনাস বিন মালিক রাঃ থেকে বর্ণিত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জান্নাত হল, মায়ের পায়ের নিচে।
[মুসনাদুশ শিহাব, হাদীস নং-১১৯]
গর্ভধারণ যেমন একজন নারীর জন্য কষ্টকর তেমন এর জন্য পুরষ্কার ও রয়েছে। যেমন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন-

“আল্লাহর পথে নিহত ব্যক্তি শহীদ, যে ব্যক্তি প্লেগে মারা যায় সে শহীদ, যে ব্যক্তি পেটে ব্যথা (অন্ত্রজনিত রোগ) বা গর্ভজনিত কারণে মারা যায় সে শহীদ, এবং যে নারী সন্তান প্রসবের সময় মারা যায়, সে-ও শহীদ।”

সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৩১১১

মুসনাদে আহমাদ (৬/৩৬৯), সহীহ ইবনে হিব্বান (২৯১৫)।

নারীদের এত সম্মান ও মর্যাদা শুধু ইসলামই দিয়েছে। নারীবাদ আর নারী মুক্তির নামে নারীকে পণ্য বানানোর মহড়া চলছে সর্বত্র। কেবলি একটি ভোগ্য পণ্য, যৌন খেলনা হিসেবে পেশ করা হচ্ছে পর্নগ্রাফী এবং নাটক সিনেমার পর্দায়।

পুরুষরা হয়েছে মেরুদণ্ড হীন, গায়রাতহীন। তাই নিজ ঘরের মেয়েকে বাইরে অন্যের মনোরঞ্জনের জন্য যেতে নিষেধ করেনা। স্ত্রী -কন্যার ইনকামের উপর বিলাসিতা করতেও দ্বিধা বোধ করেনা।

অথচ সাহাবীগণ তাদের স্ত্রীদের নাম অন্যকেও উচ্চারণ করবে এটাও পছন্দ করতেন না। হায় আফসোস!!

রেফারেন্স :

১. আল-কুরআন
২.সহীহ-হাদিস
৩.গুগল
৪.চ্যাটজিপিটি
৫.ফেমিনিস্ট প্রপাগাণ্ডা
৬.শায়খ ইমরান হোসেন
৭.ফেসবুক
৮. হিজাব আমার পরিচয়
৯.মাওলানা উমায়ের কোব্বাদী
১০.শাইখুল ইসলাম হযরত আব্দুল মালেক
১১.মুফতী লুৎফর রহমান ফরায়েজী হাফি:
১২.জাতীয় মুফতি বোর্ড
১৩.ড. মো. সরোয়ার হোসেন
১৪.আবু হুসাম তারফাবী
১৫.আহকামুল কুরআন লিলজাসসাস ২/৩৪৪, মাকালাতুন ফিত তাশাইউ ৪৮/৩৬,
১৬.নিনা অ্যাপ্টন, লাভ এ্যান্ড দ্যা ইংলিশ; পৃষ্ঠা ৩৩৮ (১৯৬০), হামারে আয়েলী মাসায়েল; পৃষ্ঠা ১৮৪, ৮৫)
১৭.অসমাপ্ত আত্মজীবনী, শেখ মুজিবুর রহমান;

১৮. মাওলানা হাফিজুর রহমান

উপসংহার :

নারীবাদ বর্তমানে এমন এক মতবাদ ও আন্দোলন প্রচার করছে যার ফলে শুধু নারীরা নয় সবাই ভুক্তভোগী হচ্ছে সামাজিক, পারিবারিক ও মানসিক ধ্বংসের। ধর্মবিমুখতা ও আত্নকেন্দ্রীকতায় অন্ধ হয়ে উঠছে সমাজ। স্বামী -সন্তান থেকে শুরু করে বৃদ্ধ বাবা-মা কেও বাদ পড়ছেনা এর রোষানল থেকে।

নারী স্বাধীনতার বুলি আওড়ায় নারীকে পরিণত করেছে ভোগপণ্যে। নারীরা নিজেরাও বুঝতেছে না তারা কিসের ফাঁদে আটকা পড়েছে। সংসার, মাতৃত্ব, নারীত্ব সব হারিয়ে শুধু আত্নকেন্দ্রীক হয়ে বসবাস করছে।

এলজিবিটিকিউ, ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুকে সুবিধাবাদী নারীবাদীরা সাধারণ নারীদের দ্বারা নর্মালাইজ করে নিচ্ছে।

ধর্মবিমুখ হবার কারণে ইন্টারেফইথ বিয়ে করছে। সন্তানেরা ধর্মের বিষয়ে হচ্ছে দিশাহীন। বিলবোর্ড, পোস্টার এমনকি ছেলেদের রেজারের বিজ্ঞাপনে পর্যন্ত নারীকে দেখানো হচ্ছে। নারীর দেহকে দেখে মজা নিচ্ছে সবাই।

পর্ণগ্রাফি, ধর্ষণ বেড়ে সমাজ হয়ে উঠছে বসবাস অযোগ্য।

শিশুরাও কবলে পড়ছে নারীবাদের। কোমলমতি শিশুরা বড় হচ্ছে মায়ের আদর-যত্ন ছাড়া নিরাপত্তাহীনতায়।

সমতার কথা বলে শুরু করেছে প্রতিযোগিতা। স্বামী যার সহযোগী হবার কথা ছিলো তাকেই বানিয়ে দিয়েছে প্রতিযোগী। ফলে দিন দিন বাড়ছে ডিভোর্স ও ব্রোকেন ফ্যামিলির সংখ্যা। নারীকে কর্মজীবনের যুদ্ধে ঠেলে দিয়েছে, কিন্তু শান্তি কেড়ে নিয়েছে তার মন থেকে। আজ যে মা সকালে অফিসে যায়, সন্তানের চোখে তাকানোর সময় পায় না। যে স্ত্রী ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে, স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার শক্তি হারিয়ে ফেলে এগুলোই নারীবাদের "সাফল্য"।

যিনা, ব্যভিচার, প্রতিযোগিতা, অবহেলায় যখন নারীবাদ ভর্তি তখন স্বস্তি দেয় একমাত্র ইসলাম।

বন্যেরা যেমন বনে সুন্দর, শিশুরা মায়ের কোলে। ঠিক তেমনই নারীরা ঘরেই ভালো। রব্বাতুল বাইত বা ঘরের রাণী ছাড়া কি ঘর কখনো ঘর থাকে।

একটা বাড়িকে প্রাণ দেয় একজন নারী। সেটা অট্টালিকা হোক কিংবা কুঁড়ে ঘর। ঘরের রাণী ছাড়া কেমন একটা বাড়িই থাকে।

সমাজের শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ফিরিয়ে আনা, যিনা-ব্যভিচার রোধ, ফেতনা রোধের জন্য ইসলামি শাসনের কোনো বিকল্প নেই।

ইসলাম নারীর জন্য ঘরকে "বন্দিত্ব" নয়, বরং "সম্মান ও শান্তির আশ্রয়" বানিয়েছে।

যেখানে নারী তার পরিবার, সন্তান ও সমাজকে গড়ে তোলে সেটাই তার সর্বোচ্চ অবদান। আজ যখন পাশ্চাত্য সমাজে নারীবাদের নামে বিবাহের মূল্যবোধ নষ্ট হয়েছে, সন্তান জন্মদানে অনীহা বেড়েছে, একাকিত্বে ভরা মানুষগুলো আত্মহত্যা করছে — তখন ইসলামি সমাজে এখনও মায়ের কোলে সন্তান নিরাপদ, পরিবারের বন্ধন অটুট, আর নারীর প্রতি সম্মান জীবন্ত।

অতএব, নারীবাদ কোনো মুক্তির পথ নয়; বরং এক বিভ্রান্তিকর ফাঁদ, যা নারীকে তার প্রকৃত পরিচয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

নারীর সত্যিকারের মুক্তি নিহিত আছে ইসলামের মর্যাদাপূর্ণ বিধান মানার মধ্যে যেখানে নারী কেবল কর্মী নয়, বরং মা, বোন, কন্যা ও স্ত্রী হিসেবে এক পূর্ণাঙ্গ মানুষ;

যার সম্মান আসে পর্দায়, তার প্রভাব আসে ভালোবাসায়,আর যার স্বাধীনতা নিহিত থাকে আল্লাহর নির্দেশে আত্মসমর্পণের মধ্যেই।

ইসলাম নারীকে আটকায় না। প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদা দেয়। ফেমিনিজম নারীকে মুক্তি দেয় না। নারীর ইহকালীন ও পরকালীন ধ্বংস নিশ্চিত করে।